সাধক
রামপ্রসাদ

স্বামী বামদেবানন্দ প্রণীত

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা—৩

দুই টাকা

প্রকাশক—

স্বামী আত্মবোধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার

কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর—

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শীল

শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

এই বাঙ্গালা দেশ হইতেছে বিশেষ করিয়া কালী ও কৃষ্ণের দেশ—মধ্যযুগ হইতে বাঙ্গালী হিন্দু জনগণ ভীষণ মধুর কালী-কৃষ্ণ-ভাবের উপাসক হইয়া আছে। সগুণ সাকার উপাসনা হিন্দুর মধ্যে যে-সমস্ত দেব-প্রতীককে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, সেগুলির মধ্যে শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রী গভীরত্বে গম্ভীরত্বে প্রসারে সর্ব্বন্ধরত্বে অপূর্ব্ব, পৃথিবীর অন্য তাবৎ দেব-কল্পনা, জ্ঞানরূপী শিব, শক্তি ও মাতৃরূপিণী উমা, প্রেমরূপী বিষ্ণু এবং সমৃদ্ধি-সৌন্দর্য্যময়ী শ্রীর কল্পনার পাদপীঠের কাছেও পঁহুছিতে পারে না। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভক্তেরা বিশেষভাবে নটরাজ শিবের কল্পনার দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিলেন; উত্তর ভারতের জনগণের চিত্তে যেমনি সীতাপতি রাজা রামচন্দ্র একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে তেমনি একদিকে জগজ্জননী উমা সংহারময়ী অথচ স্নেহময়ী কালীরূপে নিজ ভীষণতা ও কারুণ্য উভয় ভাব লইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছেন; এবং অন্যদিকে মহাবিষ্ণু বংশীধারী রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণরূপেও বাঙ্গালীর হৃদয়-কমলে বিরাজ করিতেছেন।

কৃষ্ণ ও কালী, ইঁহাদের লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ হইয়াছে। কৃষ্ণ-বিষয়ক সাহিত্য বাঙ্গালা গীতি-কবিতার ক্ষেত্রের অনেকটা জুড়িয়া আছে। এই সাহিত্য প্রসারে ও সৌন্দর্য্যে বিশাল ও মনোহর—'বৈষ্ণব পদাবলী' নামে এই সাহিত্য বাঙ্গালীর হৃদয়ের ধন। কালী-বিষয়ক গীতি সাহিত্য, সৌন্দর্য্যে ও সৌকুমার্য্যে এবং বিস্তারে ও ব্যাপকতায় কৃষ্ণ-বিষয়ক গীতি-সাহিত্যের চেয়ে বড় নয়, ইহা অপেক্ষা প্রাচীনও নয় ; কিন্তু ভাবুকতায়, গভীরতায়, আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ইহা যে কোনও গভীরভাবের গীতি-সাহিত্যের প্রতিস্পর্দ্ধী এবং ইহার স্বকীয়-ভক্তি-রস, মাতৃ-প্রতীকে ঈশ্বরের সাধনা ও উপলব্ধি, এই শাক্ত গীতি-সাহিত্যকে বিশিষ্ট শক্তি-যুক্ত করিয়াছে, ইহাকে বাঙ্গালীর অত্যন্ত আদরের বস্তু করিয়া রাখিয়াছে।

শাক্ত গীতি-হারের মধ্যমণি হইতেছে প্রসাদ-পদাবলী। রামপ্রসাদ বাঙ্গালী হিন্দু গণমনের পরিচায়ক ভক্ত কবি। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আলোচনা, তাঁহার রচনার সহিত পরিচয়, যত বেশী করিয়া হয় ততই মঙ্গল। প্রস্তুত গ্রন্থে অতি উপযোগী ভাবে দরদের সহিত এই আলোচনা এবং এই পরিচয় ঘটাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে। আশা করি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ স্বামীজীর এই সরল অনাড়ম্বর

ভাবশুদ্ধ সন্দর্ভে পরিতৃপ্ত হইবেন। বইখানি আমার ভাল লাগিয়াছে; আশা করি ইহা অন্য অনেকেরও ভাল লাগিবে; এবং ইহার দ্বারা প্রসাদের পদের সহিত বহু বাঙ্গালী ও অন্য পাঠক কথঞ্চিৎ পরিচয়-সাধন করিতে পারিবেন। ইতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩।২০০৩ } শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশ-তালিকা

- রামেশ্বর সেন
  - রাম রাম সেন
    - রামপ্রসাদ (সাধক)
      - পরমেশ্বরী
      - রামদুলাল
        - রাজচন্দ্র সেন
          - কালাচাঁদ সেন
          - গোরাচাঁদ সেন
      - রামমোহন
        - জয়নারায়ণ সেন
          - গোপালকৃষ্ণ সেন
            - কালীপদ সেন
        - দুর্গা সেন
      - জগদীশ্বরী

নিবেদন

সংক্ষিপ্ত রামপ্রসাদের জীবনী প্রকাশিত হইল। কলিকাতারই অতি নিকটে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া তীব্র সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সুমিষ্ট গান আজ বাংলার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত, ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত। সাধক রামপ্রসাদের পদাবলীতে বাংলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রায় সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক 'প্রভাকর' পত্রে রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের বিষয়ে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়া যান। ইহা ব্যতীত, 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'-কার স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেন। ইহার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাটিয়া গেল, প্রসাদ-সম্বন্ধে নূতন কোন বিশেষ তথ্য কেহই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়; বাংলা তথা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়, নিশ্চয়ই।

রামপ্রসাদের গানে আছে—

'লাখ উকিল করেছি খাড়া' অর্থাৎ মনে হয়, রামপ্রসাদ যেন এক লক্ষ গান রচনা করিয়া যান। কিন্তু আজ

শত চেষ্টায়ও কম-বেশী আড়াই-শ' গানের বেশী পাওয়া গেল না। ভবিষ্যতে কেহ যদি আরও কিছু গান-সংগ্রহের চেষ্টা করেন বা জীবনী-সম্বন্ধে নূতন কোন কিছু বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই।

আর একটা কথা, অনেক সময়ে দেখা যায়, মহাপুরুষ বা সাধক মহাজনের জীবনী-সংগ্রহে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সেই জন্য অনেকে গ্রন্থ বাড়াইবার জন্য সামান্য ঘটনাবলীকে ফেনাইয়া নাটক অথবা উপন্যাস লিখিয়া বসিয়া থাকেন। রামপ্রসাদ-জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মহাপুরুষ-জীবনকে উপন্যাস-আকারে সাজাইয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা উচিত নয়। যতটুকু তথ্য ঠিক মত পাওয়া যায়, সেইটুকুই জনসমাজে ধরিয়া-দেওয়া ভাল। জীবনী-সংগ্রহ নাই বলিয়া উপন্যাস লিখিব, এ কোন বুদ্ধিমানের যুক্তি হইতে পারে না।

প্রসাদ-জীবনের যথাযথ ঘটনাবলী লইয়া এই বইখানি লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নয়। শেষ অধ্যায়ে প্রসাদ-পদাবলী এবং তাঁহার অন্যান্য রচনাবলীর কিছু কিছু অংশ সন্নিবিষ্ট হইল।

রামপ্রসাদের পদাবলী বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য

সম্পদ। কোন ভাবেই ইহার পরিমাপ করা যায় না। ভাষার স্বচ্ছন্দ সরল গতি, সুরের অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, ভাবের গভীরতা একত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রসাদ-পদাবলীকে অপূর্ব্ব বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। এমন প্রাণ-মাতানো গানের মহত্ত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সাধনার রাজ্যে অগ্রসর না হইলে এই সব গানের মর্ম্ম উপলব্ধি করাও শক্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রামপ্রসাদী গান বড় ভালবাসিতেন—দক্ষিণেশ্বরে সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যাকালে এবং পরেও এই গানগুলি মধুর সুরে গাহিতেন। আগন্তুক ভক্তগণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বইখানি দেখিয়া দিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন শর্ম্মা-প্রকাশিত 'প্রসাদ-পদাবলী' হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

প্রচ্ছদপটে যে ছবি দেওয়া আছে উহা গঙ্গাবক্ষ হইতে হালিশহর গ্রামের দৃশ্য।

এই বই-এর ছবিগুলি সুদক্ষ শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র দাসের সৌজন্যে পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত বন্ধু-

বান্ধব অনেকে এই বইখানির জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিয়াছেন। সকলকে অন্তরিক ধন্যবাদ।

বইখানি বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পদ-সূচী

পদ-সূচী

পদ-সূচী

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক

রামপ্রসাদ

জন্মভূমি

সাধক রামপ্রসাদের জন্মভূমি হালিশহর গ্রাম। ইহা ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী থানার অধীন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামের অপর নাম কুমারহট্ট বা কুমারহাটী। বহু কুম্ভকারের বাস ছিল বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে, ইহাই অনেকের ধারণা। তবে এই নাম সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আজও প্রচলিত আছে। কুম্ভকার ব্যতীত এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থেরও বাস ছিল। শিক্ষা-দীক্ষায় এককালে এই গ্রাম নবদ্বীপকেও পরাস্ত করিয়াছিল।

কথিত আছে, একদা নবদ্বীপের বহু পণ্ডিত এই গ্রামের পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। একজন সুচতুর কুম্ভকারকে

নানা কথা শিখাইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বুদ্ধিমান কুম্ভকার স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া একটী অল্প বয়স্ক ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডিতগণের নিকট উপস্থিত হইল। ছেলেটীকে তাহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া পণ্ডিতগণের পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত হইল। প্রত্যূষে পরিচারিকা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত। চারিদিকে কাকগুলি 'কা কা' রব করিতেছিল, ছেলেটা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—মা, কাক কেন ডাক্‌ছে? দাসী জবাবে বলিল—পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা কর, কাক কেন ডাক্‌ছে; আমি মূর্খ্য মানুষ, কি বলিব?

ছেলেটা পণ্ডিতগণের নিকট গিয়া উপর্যুক্ত প্রশ্ন করিল। জবাবে তাহারা বলিলেন—কি করে বলব, কাক কেন ডাকছে। সকাল হয়েছে তাই ডাকছে। উত্তর শুনিয়া ছেলেটা সুখী হইল না। পুনরায় মার নিকট গিয়া বায়না ধরিল। মায়ের শিক্ষানুযায়ী ছেলেটা যে অভিনয় করিতেছে ইহা পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিলেন না।

মা বলিলেন—তুই কি করে বুঝবি? তুই কি সংস্কৃত জানিস? সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—

তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিতমানসাঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥

সূর্য্যদেব অন্ধকার নাশ করিয়া আলো দান করিতেছেন।

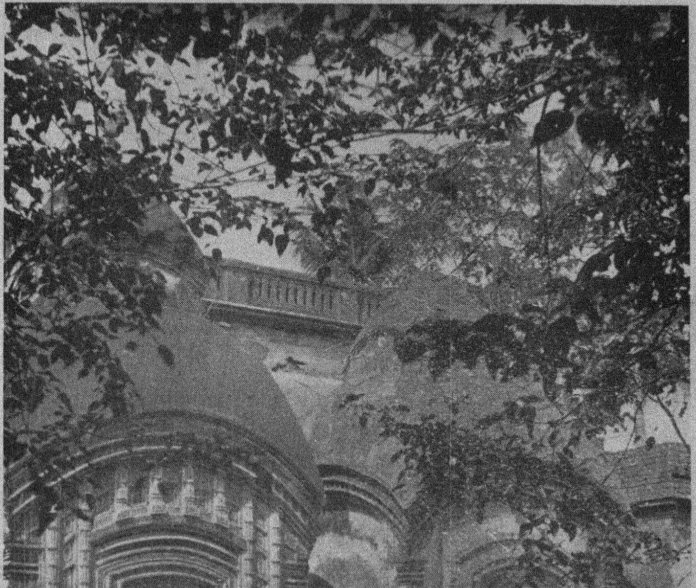
কাকদিগের মনে ভয় হইয়াছে—তাহাদের অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণকে অন্ধকার মনে করিয়া সূর্য্যদেব পাছে তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন,এই ভয়ে কাকসকল ‘বয়ং কাকাঃ, বয়ং কাকাঃ’(আমরা কাক, আমরা কাক) এই বলিয়া সূর্যদেবকে জানাইতেছে।

পরিচারিকার মুখে সংস্কৃত শ্লোকের এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত হইলেন। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এসব কোথা হতে শিখলে? উত্তরে পরিচারিকা বলিল—এ গ্রামের পণ্ডিতদের বাড়ীর কাছে আমার বাড়ী। সদাসর্ব্বদা সংস্কৃত-আলোচনা হয়, আমি তাদের কাছেই শুনেছি। পণ্ডিতগণ তখন প্রমাদ গণিলেন। যে গ্রামেব দাস-দাসীরা এতটা বিদ্যাবুদ্ধি রাখে, সে গ্রামের পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। এরূপ চিন্তা করিয়া হতাশ হৃদযে তাহারা সেই দিনই সেখান হইতে পলাযন করিলেন।

হালিশহরের পণ্ডিতগণ সব বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দিত। সামান্য নীচজাতীয় কুম্ভকারের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মান রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাহারা গ্রামের নাম রাখিলেন কুমারহট্ট বা কুমারহাটী। এই জনশ্রুতি যে কতটা সত্য জানি না, তবে এই গ্রামে যে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন এবং এখানে এককালে যে বিদ্যার চর্চ্চা খুবই ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়। আর একটী

কিংবদন্তী আছে যে, চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ ইত্যাদি নানা যোগ উপলক্ষ করিয়া যশোহরের রাজবংশীয়েরা এই স্থানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। যশোহর হইতে হালিশহর পর্য্যন্ত জাঙ্গাল নামে একটী বড় রাজপথ ছিল। আজকালও স্থানে স্থানে এই জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য বহু লোকজন লইয়া এই গ্রামে প্রায়ই গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। কুমারের আগমন উপলক্ষে ঐ সময়ে একটী বড় হাট বসিত। ধীরে ধীরে সেই হাট স্থায়ী হইয়া যায়। তদনুসারে এই গ্রামের নাম কুমারহট্ট—ইহা অনেকের ধারণা। কুমারহট্ট ও হালিশহর এই দুই নামেই যে গ্রামখানি চলিয়া আসিয়াছে তাহার অনেক প্রাচীন প্রমাণ আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীঈশ্বরপুরী এই গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভু একবার শ্রীগুরুদর্শন করিবার জন্য এইখানে আসিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে এই বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥



ভগ্নমন্দির (হালিশহর)



চৈতন্য ডোবা (৫ পৃষ্ঠা)

কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই—'ঈশ্বরপুরী' বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ॥

চৈতন্য মহাপ্রভুর দেখাদেখি সঙ্গের শিষ্যেরা মাটি উঠাইতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ স্থানটী একটী খাদে পরিণত হয়। সেই খাদটী আজও বিদ্যমান। ইহাকে চৈতন্যডোবা বলে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গলেও হালিশহর ও ত্রিবেণী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়—

বামদিকে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তৈল ধেনু কেহ করে দান॥

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় হালিশহর এককালে খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ছিল। ইহা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত। এই গ্রামের মনোরম সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহারাজ একটী বায়ুসেবনালয় এবং একটী

ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া এই জনসমাকীর্ণ গ্রামে বাস করিতেন এবং নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সাধক রামপ্রসাদও তাঁহার জন্মভূমি, বাস্তুভিটা এবং সিদ্ধপীঠসম্বন্ধে এরূপ বলিয়াছেন--

ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

হালিশহর গ্রামে আধুনিক ঠাকুরপাড়া ও চড়কডাঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানেই রামপ্রসাদের পৈতৃক ভিটা। সেখানে রামপ্রসাদের সাধন-পীঠের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন হইল গ্রামবাসীরা সেইখানে প্রসাদের একটী স্মৃতিশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুজন-কোলাহলপূর্ণ হালিশহর গ্রামখানি যে কত বড় সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা আমরা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারি। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান হালিশহর গ্রাম দেখিয়া এককালে যে ইহা ধনজনে পরিপূর্ণ ছিল তাহার কোন বিশেষ চিহ্নই পাওয়া যায় না। শুনা যায়, ১১০৭ সালে দারুণ ম্যালেরিয়া-রোগে এই মনোহর গ্রামখানি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রাম একেবারে জনশূন্য বলিলেই চলে। তাহার

পতনোম্মুখ দেবমন্দির, ভগ্ন সৌধাবলী অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে মাত্র। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার গ্রামগুলির বিচিত্র মনোরম শ্রীও বিদায় লইয়াছে। জানি না ভবিষ্যতে বাংলার শ্রী আর ফিরিবে কি না। শুধু অতীতের স্মৃতি লইয়া ভবিষ্যৎ বাংলা তাহার গৌরব অনুভব করিবে মাত্র। ইহা ছাড়া আর কি উপায় আছে ?

গোড়ার কথা

এই সুপ্রসিদ্ধ হালিশহর গ্রামে আনুমানিক ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ১১২৯ সালে এক বিশিষ্ট বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাস সেন দয়া দাক্ষিণ্যে, কোমল ব্যবহারে এবং সরল স্বভাবের গুণে তখনকার দিনে খুবই সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সেনেরা বংশ-পরম্পরায় তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন। তন্ত্রোক্ত যে কোন ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষ করিয়া তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। এই কৃত্তিবাস হইতেই সেন বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হয়। তাহার পুত্র রামেশ্বর সেন পিতার মতই দান-ধ্যান-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই পুত্র

রামরাম সেন আমাদের সাধক রামপ্রসাদের পিতা। রামপ্রসাদ তাহার নিজের জীবনী সম্বন্ধে বা তাঁহার বংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। শুধু তাঁহার প্রণীত 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে এক স্থানে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে তাহাই দেওয়া গেল—

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাস তুল্য

কীর্ত্তি কই।

দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা

কৃপামই।

সেই বংশ-সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্ব-গুণ-যুত, ছিলা কত শত মহাশয়।
অনাচার দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরলহৃদয়।
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয়া অভয়।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ী মযি

হও দয়া॥

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় দুগ্ধ জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥

গোড়ার কথা

সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
"শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহি পদধূলি॥"
"শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥"

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর

ইহা হইতেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে তাহার পিতামহের নাম রামেশ্বর এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম সেনের দুই বিবাহ ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর (সিদ্ধেশ্বরীর) গর্ভে সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী অম্বিকা ও রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা ভবানী দেবীর জন্ম হয়। ইহার পরেই রামপ্রসাদ এবং তাহার ছোট ভাই বিশ্বনাথ। রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অম্বিকা এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বিশ্বনাথের বিষয়ে কোন সংবাদ বর্ত্তমানে

সংগ্রহ করা কঠিন—তাঁহাদের সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারে না। তবে কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহিত রামপ্রসাদের ভগ্নী ভবানীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার গর্ভে জগন্নাথ ও কৃপারাম নামে দুইটি পুত্রও হইয়াছিল। উপরের বিবরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি রামপ্রসাদ নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তিনি শুধু পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা এবং রামদুলাল নামে এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের নিজের লেখা হইতেই তাহার বংশ-পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া গেল। কিন্তু শেষ বয়সের কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের নাম তাহার কোথাও পাওয়া যায় না; অথচ রামমোহন বংশে বিদ্যমান থাকিয়া রামপ্রসাদের বংশরক্ষা করিতেছে।* ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় যখন বিদ্যাসুন্দর লিখিত হয় তখন কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয় নাই, অথচ বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত অন্য কোন রচনাতে রামপ্রসাদ তাঁহার বংশের উল্লেখ করেন নাই। এই রামমোহনের জন্ম উপলক্ষ করিয়াই রামপ্রসাদ "এ সংসার ধোঁকার টাটি" এই গানটী রচনা করেন।

* প্রপৌত্র ৺দুর্গাদাস সেন মহাশয় পরে হুগলী জেলার গরলগাছ গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অমরনাথ সেন হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে বাস করিতেন।

গোড়ার কথা

পিতামাতার আদরের দুলাল রামপ্রসাদ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। যথাসময়ে পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিলেন। অদ্ভুতমেধাসম্পন্ন এই বালকটী অতি অল্প দিনেই গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিল। ছেলের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া পিতা আনন্দিত। তিনি নিজে একজন কবিরাজ, আয়ুর্বেবদশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার সুসন্তানকে এই বিদ্যায় পারদর্শী করিবার নিমিত্ত তিনি গ্রামের সংস্কৃত টোলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। অল্পদিনে পুত্র ব্যাকরণ ও কাব্যে যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিলেন। পিতার বিশেষ আগ্রহ, রামপ্রসাদ তাঁহার পৈতৃক ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু তাঁহার সেদিকে বিশেষ মনোযোগ পরিলক্ষিত হইল না। নানা বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ আছে, কিন্তু আয়ুর্বেবদ-শাস্ত্রে তেমন আগ্রহ দৃষ্ট হইল না। তাঁহার ইচ্ছা আরও কয়েকটী ভাষা আয়ত্ত করিবেন। তখন মুসলমান রাজত্ব, সুতরাং সাংসারিক জীবনে সুবিধা হইবে ভাবিয়া পিতা তাঁহাকে পারসী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে অনুমতি দিলেন। রামপ্রসাদ মনের আনন্দে এ দুটী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতা এই সময় রামপ্রসাদের বিবাহের বন্দোবস্ত

করিয়া সর্ব্বাণী নাম্নী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা বধূ ঘরে আনিলেন। রামপ্রসাদের বয়স তখন বাইশ বৎসর। কুলপ্রথানুযায়ী কুলগুরু নবপরিণীতা দম্পতিকে দীক্ষা দিলেন।

রামপ্রসাদ যে সাধারণ সংসারের মানুষ নন, অতি অল্প বয়স হইতেই ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সংসারের দিকে তাহার আকর্ষণ যে একেবারেই নাই, পিতা ইহা বহু পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার কেমন যেন এক আনমনা ভাব। মাঝে মাঝে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যান—কেন রামপ্রসাদ নিজেই বুঝিতে পারেন না। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে একটা তীব্র বেদনা সময় সময় তাহাকে বড় অস্থির করিয়া তোলে মন চায় শান্তি, নিস্তব্ধতা—কোলাহল হইতে দূরে অতি দূরে সরিয়া যাইতে চায়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স হইতেই ধীরে ধীরে এই ভাবটা হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল সাধনার রাজ্যে মন ডুবিতে চায়। পিতা আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিয়াই তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন।

কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া রামপ্রসাদ মনের আনন্দে ধীরে ধীরে সাধনার রাজ্যে ডুবিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীদিন সে সুযোগ হইল না। হঠাৎ

কুলগুরু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সময় সাধক-শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক-পণ্ডিত আগমবাগীশ কুমারহট্টে আগমন করেন। তখনকার দিনে পণ্ডিত ও সাধক হিসাবে আগমবাগীশের খুব নাম। তাঁহার আগমনে গ্রাম ধন্য হইয়া গেল এবং বহুলোক তাঁহার নিকট যাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ সুযোগ বুঝিয়া একদিন একাকী নিভৃতে তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন। পণ্ডিতপ্রবর সাধকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশ রামপ্রসাদকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—এ সামান্য মানব নহে। আনন্দে কয়েকদিন তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত সাধনাবিষয়ে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পর আগমবাগীশ চলিয়া গেলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ দ্বিগুণ উৎসাহে তান্ত্রিক সাধনায় মগ্ন হইলেন। পিতা দেখিলেন, সাংসারিক কোন বিষয়ে রামপ্রসাদের আগ্রহ একেবারেই নাই। নানা ভাবে ধর্ম্মকার্য্যে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। পিতা নিজে ধার্ম্মিক; সুতরাং পুত্রকে ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিবার কথা কোন দিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। বরং তাহাতে তিনি আনন্দিতই হন। কিন্তু সংসার তো আছে। পিতার সম্পত্তি বিশেষ কিছু নাই, কোন রকমে অভাবের সংসার সুখে-দুঃখে চলিয়া যায়। তাহার অবর্ত্তমানে রামপ্রসাদকেই সংসার চালাইতে

হইবে। অথচ পুত্রের সংসারকার্য্যে সেরূপ আগ্রহ না থাকায়, পিতা মাঝে মাঝে চিন্তাকুল হইয়া পড়িতেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন দিন কিছু বলিতেন না। যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্বসংসার চলে, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর কি আর এই ক্ষুদ্র সংসারের ভার লইবেন না? ক্ষুদ্র পরিবারের এই কয়েকটী প্রাণীকে কি আর দেখিবেন না? উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতা এইভাবে আপনার মনকে বুঝাইতেন।

এদিকে রামপ্রসাদ বিশেষ আগ্রহে পূজাপাঠ, জপ-ধ্যানে মগ্ন—নানা বিদ্যাশিক্ষায়ও কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু চিরকাল সমান যায় না। হঠাৎ রামপ্রসাদকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন।

অভাবের তাড়নায়

হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রামপ্রসাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন তিনি নানা বিদ্যাশিক্ষায় তাহার সমগ্র মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাহার বেশ জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। পারসী এবং হিন্দী ভাষাতেও ইতোমধ্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে যখন বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটা

দমকা হাওয়া তাঁহার জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দিল। পিতৃবিয়োগে সত্যই তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। মৃত্যুসময়ে পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই। স্নেহময়ী জননী, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারের সকলকে লইয়া তিনি অকুল সাগরে ভাসিলেন। কি করিবেন? সংসারের অভিজ্ঞতা তাঁহার কিছুই নাই, জীবিকার্জ্জনের উপায়ও কিছু জানা নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া রামপ্রসাদ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কূলকিনারা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। এই ক্ষুদ্র সংসারের বোঝা যে এত ভারী, পিতা-বর্ত্তমানে রামপ্রসাদ একদিনের জন্যও তাহা অনুভব করেন নাই। অথচ আজ ইহা তাহার জীবনে বিপন্যয় আনিয়াছে, সহজ স্বচ্ছন্দ গতিকে মন্থর করিয়াছে, আনন্দের সংসারে বিষাদের কালিমা লেপিয়া দিয়াছে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া রামপ্রসাদ তাহার একমাত্র আরাধ্যা দেবী আদ্যাশক্তি জগজ্জননী মহামায়ার নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইলেন।

কিছুকাল এইভাবে কাটিল, কিন্তু উপায় কিছুই হইল না। অবশেষে রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে করিতে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য কলিকাতা শহরে আসিলেন।

তখনকার কলিকাতা এত বড় না হইলেও, সেখানে বহু ধনী লোকের বাস ছিল, সুতরাং কিছুদিন চেষ্টার পরই রামপ্রসাদের চাকুরী জুটিল। গরাণহাটায় নবরঙ্গ-কুলাধিপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটিতে নবাগত যুবক কেরানী হিসাবে নিযুক্ত হইলেন। মাহিনা ৩০৲ টাকা।*

৩০৲ টাকার কেরানীগিরি পাইয়া রামপ্রসাদ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। জগজ্জননী মা আদ্যাশক্তি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, তাঁহার করুণ নিবেদন শুনিয়াছেন, তাই তিনি মনের আনন্দে গান লিখিয়া বসিলেন—"আমায় দাও মা তবিলদারী।" রামপ্রসাদের হুঁশ নাই, হিসাবের খাতায় গান লেখা! মা তাঁহার প্রতি প্রসন্না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন হিসাবের খাতায়—"আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।"

ইহার পর হইতেই রামপ্রসাদ মায়ের নামে মাতিয়া উঠিলেন। চাকুরী লইয়াছেন, সুতরাং হিসাবের খাতা তাঁহাকে লিখিতেই হইবে। কিন্তু প্রাণ চায় শুধু মায়ের

* কেহ বলেন, ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে, আবার কেহ কেহ বলেন—বাগবাজারের মদনমোহনবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গোকুল মিত্রের বাড়ীতে চাকুরী হইয়াছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নামগানে বিভোর হইয়া থাকিতে। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ভক্তির আতিশয্যে বিভিন্ন সময়ে গানের উৎসমুখ যেন উন্মুক্ত হইতে লাগিল। পাছে ভুলিয়া যান, তাই হিসাবের খাতাতেই লিখিয়া রাখেন, হুঁশ নাই। মাঝে মাঝে কালীনাম, দুর্গানামও হিসাবের খাতায় স্থান পাইল। সে এক অভিনব ব্যাপার! দেখিতে দেখিতে দুর্গানাম, কালীনাম, প্রসাদীগান প্রভৃতিতে মনিবের হিসাবের খাতা ভরিয়া উঠিল। এইভাবে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। সাধারণ দৃষ্টিতে এ নিছক পাগলামি বলিয়া মনে হয়। রামপ্রসাদ বিশেষ জানেন, হিসাবের খাতা মায়ের গান, কালীনাম লিখিবার জন্য নয়। ধরা পড়িলে চাকুরী তো যাইবেই, আরও বহু অনর্থ ঘটিতে পারে; কিন্তু কার্য্যকালে হুশ থাকে কই? আদ্যাশক্তি মহামায়ার নামে সময় সময় এত তন্ময় হইয়া পড়েন যে তখন হিসাব বে-হিসাব হইয়া যায়। সাধারণ জগতের নিক্তির হিসাব মনে থাকে কই? মন তখন ক্ষুদ্র সাধারণ গণ্ডী পার হইয়া উচ্চ উচ্চতর প্রদেশে চলিয়া যায়—তাই রামপ্রসাদ হিসাবের খাতায় গান লিখেন—'আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।' ক্রমে রামপ্রসাদ গানরচনায় এতটা তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে কাজ-কর্ম্মে ক্রটী-বিচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া

উঠিলেন এবং মনিবের নিকট পুনঃ পুনঃ নালিশ জানাইতে লাগিলেন। দয়ালু মনিব প্রথম প্রথম বিশেষ কিছুই বলিতেন না। নবাগত যুবকের চাকুরী যাইলে পরিবারের ভরণপোষণ হইবে কি করিয়া? কিন্তু ক্রমাগত নালিশ শুনিয়া তিনিও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন রামপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিবারজন্য আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারীরা সুযোগ বুঝিয়া রামপ্রসাদ এবং হিসাবের খাতা দুই-ই মনিবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। হিসাবের খাতাখানি হাতে লইয়া মনিব দেখিলেন একি! আষ্টে-পৃষ্ঠে কালীনাম, দুর্গানাম মায়ের নামগান! প্রথমেই গানটা চোখে পড়িল –

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মতো পদ পাইতো সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥

বার বার তিন বার তিনি এই গানটী পড়িলেন। ধার্ম্মিক মনিব গান পড়িতে পড়িতে গম্ভীর হইয়া গেলেন। "আমি বিনা মাহিনার চাকর, তোমার চরণ-ধূলার অধিকারী" —এই ছত্রটী পড়িবার সময় তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সস্নেহ দৃষ্টিতে রামপ্রসাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—রামপ্রসাদ, এ তুচ্ছ সংসারে কাজ করার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ কর নাই। তুমি তবিলদারী চেয়েছ, সময় হ'লেই পাবে। আপাততঃ ঘরে গিয়া মায়ের নাম-গুণগান কর এবং সেজন্য প্রস্তুত হও। হিসাবের খাতা তুমি নষ্ট কর নাই, বরং তোমার পবিত্র হস্তের লেখনীতে খাতা পবিত্র হ'য়েছে। বংশানুক্রমে এই খাতা আমার ঘরে যত্নে থাকবে এবং তোমার ভগবদ্ভক্তির সাক্ষ্যপ্রদান করবে। এখন তুমি বাড়ী যাও। তুমি আমার সংসার হতে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি পাবে।

মনিবের সম্মুখে যখন রামপ্রসাদের ডাক পড়িয়াছে তখন হইতেই তিনি মায়ের নামে বিভোর, হুঁশ নাই। মনিবের দয়ার কথা ভাবিয়া তিনি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গান ধরিলেন—

মন, তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে॥

অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস্‌রে তুই ব'সে ব'সে ॥
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধ'রবে না আর কাল বিষে ॥
গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধরে যতনে ক'ষে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে ॥

মিত্র মহাশয় গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রচুর পারিতোষিক দিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ ভাবে বিভোর—

"আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী।"

সাধনার প্রারম্ভে

বাড়ী আসিয়া রামপ্রসাদ তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে এই শুভ সংবাদ দিলেন। মা জগদম্বার কৃপা মনে করিয়া গর্ভধারিণী তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন। পিতার মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র সংসারের বোঝা রামপ্রসাদের জীবনকে দুর্ব্বিবহ করিয়া তুলিয়াছিল। চাকুরী পাইয়া সে ভার খানিক লাঘব হইল বটে, কিন্তু কেরানীগিরির চাপেতে তাঁহার জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ গতি মাঝে মাঝে বাধা পাইতেছিল। সুমধুর মাতৃনামের অবিরল ধারা মাঝে মাঝে যেন থামিয়া

যাইতেছিল। ইহার জন্য তাঁহার মনে দুঃখও কম হইত না। কিন্তু উপায় ছিল না। আজ মহামায়া কৃপা করিয়া রামপ্রসাদের সে বাধাও দূর করিলেন। চাকুরীর চাপ হাল্কা হইয়া যাওয়াতে সত্যসত্যই তিনি আজ মুক্ত। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই; মায়ের নামে বিভোর হইয়া গেলেন। নিত্য নূতন গান তিনি রচনা করিতেন। গঙ্গাস্নানে গিয়া আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে মায়ের নাম গাহিতেন। কুলুকুলুনাদিনী পতিত-পাবনী গঙ্গাবক্ষে সে স্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশে বাতাসে খেলিয়া বেড়াইত। সে স্বরের মোহিনী শক্তিতে বহুলোক আকৃষ্ট হইত। গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া পথশ্রান্ত পথিক আবেগভরে গান শুনিত। দিনের পর দিন সুমধুর গান শুনিবার জন্য গ্রামের লোক ছুটিয়া আসিত। গঙ্গাস্নানার্থী যাত্রীদের ভিড় লাগিয়া যাইত। রামপ্রসাদ গানে বিভোর—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।"

গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহীদের অনেকে নৌকা থামাইয়া বিভোর হইয়া রামপ্রসাদের গান শুনিত। কিন্তু তাঁহার হুঁশ নাই, কে যায়, কে আসে কে তাঁহার গান শুনে। মায়ের নামে রামপ্রসাদ যেন পাগলপারা হইয়া গেলেন। কথিত আছে—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদা নৌকাভ্রমণ-কালে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া

যান। যতক্ষণ গান চলিল, গঙ্গাবক্ষে নৌকা থামাইয়া তিনি একান্ত মনে গান শুনিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ মায়ের নামে বাহ্যজ্ঞান-হীন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গভীর ভাবে মগ্ন। অনেকক্ষণ এইভাবে চলিল, ধীরে ধীরে রামপ্রসাদ তীরে উঠিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। মহারাজ নৌকা তীরে ভিড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উপাসনা শেষ হইলে তিনি রামপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন এবং নবদ্বীপে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে গুণী লোক, সুতরাং গুণের আদর জানিতেন। গুণী লোক পাইলেই আদর করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার সভায় রাখিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার ন্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্নের সভাও খুবই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাধক-চূড়ামণি আগমবাগীশকে গুরুপদে বরণ করিয়া সভার প্রধান রত্ন-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি গুণী লোককে তাঁহার সভায় রত্ন হিসাবে রাখিয়াছিলেন। আদিরসের কবি ভারতচন্দ্রকে তিনি রায় ও গুণাকর উপাধি এবং প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন।

জহুরী জহর চিনে। সাধক রামপ্রসাদকে দেখিয়াই

তিনি বুঝিলেন এ সামান্য ব্যক্তি নয়। মহারাজ তাঁহাকে সাদর আমন্ত্রণ করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া রামপ্রসাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজসভায় চাকুরী! রাজার চিত্তবিনোদন করিতে হইবে? তিনি যে একমাত্র আরাধ্যা দেবী মায়ের পায়ে সমগ্র মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। যে হৃদয়-সিংহাসনে মা জগদম্বাকে বসাইয়াছেন—সেখানে মহারাজের স্থান কোথায় হইবে? অস্বীকার করিলে রাজার কোপানলে পড়িতে হইবে। ভাবিয়া ভাবিয়া রামপ্রসাদ কূলকিনারা কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজার অযাচিত দান তিনি বিনীতভাবে অস্বীকার করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং প্রসাদের তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এক শত বিঘা নিষ্কর জমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যাহাতে প্রসাদ ভোগ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। রামপ্রসাদ 'নিমকহারাম' নন, সুতরাং রাজার এ অযাচিত দান তিনি ভুলিলেন না—কিছুদিন পর 'বিদ্যাসুন্দর'* নামক কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া মহারাজকে উপহার দেন।

* রামপ্রসাদের রচনাবলীতে আমরা 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

আর একটী কিংবদন্তী আছে। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা তখনকার দিনে প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি এই সময় মাঝে মাঝে নৌকারোহণে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। একদিন দূর হইতে হঠাৎ তিনি রামপ্রসাদের গান শুনিতে পান। সুমধুর কণ্ঠের গান তাঁহার বড়ই ভাল লাগিল। তিনি নৌকা তীরে ভিড়াইতে বলিলেন এবং কে এমন মধুর গান গাহিতেছে সংবাদ লইলেন। পরিচারকরা বলিল, এক ব্যক্তি গঙ্গা-জলে দাঁড়াইয়া এই গান গাহিতেছে। তিনি নিকটে আসিয়া রামপ্রসাদকে তাহার নৌকায় উঠিতে বলিলেন। নবাব তাঁহার সুমধুর কণ্ঠের আর একটা গান শুনিতে চাহিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের বুঝিবার উপযোগী একটি হিন্দী গান আরম্ভ করিলেন। নবাবের হিন্দী গান ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন—তুমি এইমাত্র যে গান গাহিয়াছিলে তাহাই গাও। রামপ্রসাদ এবার সুদুর্লভ কণ্ঠে তাহার স্বরচিত গান বিভোর হইয়া গাহিতে লাগি-লেন। নবাব সাহেব গান শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া প্রসাদকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তখন তিনি তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, পরে এক সময় মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাবের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ডুব দেরে মন কালী ব'লে

রামপ্রসাদ তাঁহার পুরাতন মনিব মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে মাসিক ৩০৲ টাকা মাসহারা পাইতেন, সুতরাং মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা ইহাতেই হইত। অতিরিক্ত তিনি আশা করেন নাই। অথচ আজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতায় সংসারের সকল অভাব দূর হইল। প্রসাদ মায়ের আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণতি জানাইলেন।

আজ মায়ের কৃপায় প্রসাদের সকল অভাব দূর হইয়াছে। মা অন্নপূর্ণার বিশেষ কৃপায় প্রসাদের ভাণ্ডার ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। যে সংসারের বোঝা একদিন বড়ই ভারী বলিয়া বোধ হইতেছিল, যে বোঝা তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিযাছিল, মা অন্নপূর্ণা সে ভার লইয়াছেন। সুতরাং প্রসাদের আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি সাধন সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। "ডুব দেরে মন কালী ব'লে" রামপ্রসাদ হৃদয়-সমুদ্রে ডুবিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সাধনার রাজ্যে ডুবিয়া যাওয়া যে কি জিনিস, পাঠক! আমাদের মত সাধারণ মানুষের ধারণায় আসে না। বাসনা কামনার আকর্ষণে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যে কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়, উন্মাদের মত ছুটাছুটি

করে—সাধারণ মানুষ বুঝিতেই পারে না, শুধু অগাধ স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। স্রোতের টানে ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের উত্থান-পতন চলিতে থাকে এবং একদিন এই ভাবেই সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র জীবনের যবনিকা টানিয়া দেয়। সাধক বিক্ষিপ্ত মনকে পুনঃ পুনঃ স্থির করিবার চেষ্টা করিয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া দেন। এই সাধনা যে কি কঠোর জিনিস, তাহা সাধারণ মানুষের ধারণার বাহিরে। রামপ্রসাদ সাধনার রাজ্যে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তিনি চান শুধু নির্জ্জন স্থান. লোকসঙ্গ আর ভাল লাগে না।

তাঁহার বাটীর নিকটে একটী উদ্যান ছিল। বৃক্ষ-লতায় পরিপূর্ণ এই স্থানটী অতীব নির্জ্জন। সুতরাং সাধনার পক্ষে অতি মনোরম। প্রসাদ সেখানে পঞ্চবটী * রোপণ করিয়া পঞ্চমুণ্ডীর † আসন স্থাপন করিলেন। ইহাই রামপ্রসাদের সুবিখ্যাত সিদ্ধাসন। কথিত আছে, এই আসনেই সাধনা করিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী জগজ্জননী মহামায়ার কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

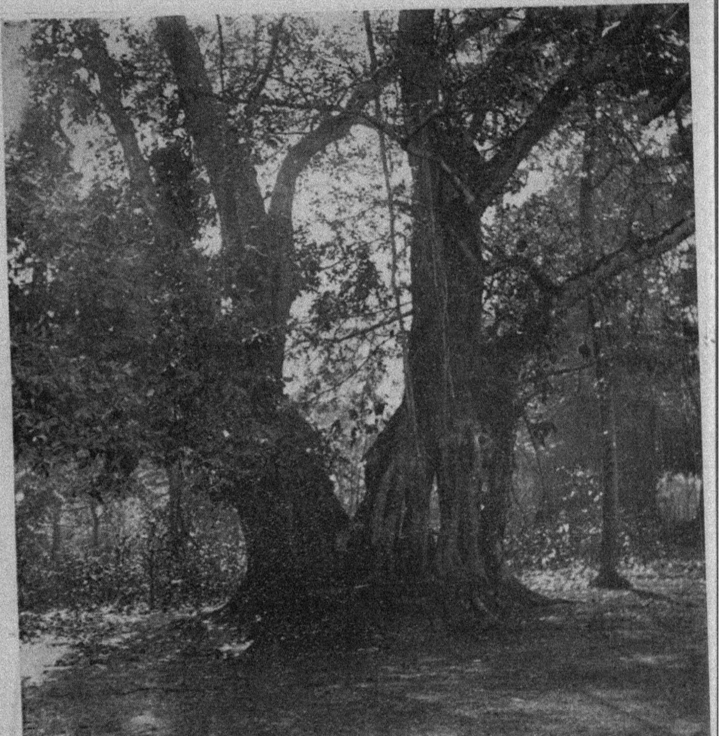
সাধনার অনুকূল স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইবার

* পঞ্চবটী—অশ্বত্থ, বেল, আমলকী, অশোক ও বট—এই পাঁচটী বৃক্ষ একত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া 'পঞ্চবটী' স্থাপিত হয়।

† পঞ্চমুণ্ডী—সর্প, ভেক, শশ, শৃগাল ও নরমুণ্ডে রচিত হয়; কোথাও কোথাও পঞ্চজাতীয় নৃমুণ্ডেই রচিত হইয়া থাকে।



রামপ্রসাদের পঞ্চবটী (ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত ফটো হইতে)



পঞ্চবটীর অপর দৃশ্য

ডুব দেরে মন কালী ব'লে

রামপ্রসাদ ধীরে ধীরে "হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে" ডুবিতেছেন—মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা-হোম-জপ-তপে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দুইবেলা আহারের সময় ব্যতীত তিনি গৃহে বড় একটা যাইতেন না। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় কেহ রামপ্রসাদের দেখা পাইত না, বাড়ীতেও যাইতেন না। সাধনার রাজ্যে তাঁহার মন ক্রমশঃই লীন হইতেছে। "রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে"। রামপ্রসাদ মায়ের দর্শনের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মা, দেখা দেও—মা, দেখা দেও—বলিয়া দিনরাত কি আকুল প্রার্থনা! মায়ের গান রচনা করিয়া অবিরত সেইগুলি গাহিতেন—

আমি কি এমনি রবো, মা তারা।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজন-বিহীন,
দীনহীন অসম্ভব॥
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ওপদ পাবো মা তারা॥
সুপুত্র কুপুত্র, যে হই সে হই,
চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কবো মা তারা॥

প্রসাদ কহিছে তারা-ছাড়া নাম
কি আছে যে আর তা লবো।
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব, মা তারা॥

কিন্তু ব্যাকুলতা বাড়িযাই চলিল, মাযের দর্শন আর হইল না।

নির্জ্জন নিশীথে রামপ্রসাদ সংজ্ঞাহীন, মায়ের দর্শন হইল না। কত অমাবস্যার মহানিশা কাটিয়া গেল, কত পূর্ণিমার রাত্রি অবসান হইল, মায়ের দর্শনলাভ হইল না দেখিয়া রামপ্রসাদ ব্যাকুল।

মা মা বলে আর ডাকবো না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাবো,
মা ব'লে আর কোলে যাবো না॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছে চক্ষু-কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না॥

ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
মা হ'য়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠর-যন্ত্রণা ॥

আশার আশায় এই ভাবে বহু দিন কাটিল। বাহ্যিক জ্ঞান প্রায়ই থাকিত না। অবশেষে একদিন ভক্তের করুণ মিনতিতে মায়ের আসন টলিল। সত্য সত্যই মা জগদম্বা প্রথম দর্শন* দিয়া প্রসাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। প্রসাদ আনন্দে বিভোর, মাতৃনামে ভরপুর। বহুদিন অপেক্ষা করিয়াই ছিলেন। আজ জগজ্জননীর কৃপায় বাসনার পরিতৃপ্তি হইয়াছে। মনের আনন্দে কি যে করিবেন, কাহাকে বলিবেন, খুঁজিয়া পান না।

এই সময় অপরূপ দিব্য জ্যোতিতে তাঁহার শরীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবেশীরা দেখিলে হঠাৎ চিনিতে পারিত না, স্তম্ভিত হইত। এই কি সেই রামপ্রসাদ! কি দিব্য কমনীয় কান্তি—কি স্নেহময় মূর্ত্তি! অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতি যেন সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে! দিনের পর দিন আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী এ

* রামপ্রসাদের বাস্তুর পশ্চিম কোণে এখনও একটী ডোবা আছে। কথিত আছে, তাহার পূর্ব্বধারের বাগানে মায়ের সহিত প্রসাদের প্রথম দর্শন হইয়াছিল।

দিব্য জ্যোতি দেখিত। কিন্তু কেন এমন হয় বুঝিত না, অনুমানও কিছু করিতে পারিত না।

ভাব-দর্শনাদি সম্বন্ধে নানা কথা

সাধক-জীবনে সময় সময় বহু অলৌকিক ঘটনার পরিচয় আমরা পাই! সংসারের সাধারণ মানুষ এ জাতীয় ঘটনাবলীকে ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। রামপ্রসাদের জীবনেও এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বহু আছে। সেজন্য বিষয়টী একটু বিশদভাবে আলোচনা না করিলে পরিষ্কার হইবে না।

প্রথমতঃ, মানুষের অসংযত মনটিকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসপূর্ব্বক সংযত করিতে হইবে। নতুবা সাংসারিক জীবনে শান্তি পাওয়া যায় না। এই জাতীয় কথাগুলি আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাই। কারণ কি? মনই মানুষ-জীবনের কাণ্ডারী। ধর্ম্মজীবন, সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন, সবই মনের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। সেইজন্য মন যদি বাউলা হইয়া যায় তাহা হইলে সামাজিক জীবন প্রভৃতি সবই বৃথা—বিশেষ কোন কাজেই লাগে না, এ আমরা বেশ দেখিতে পাই। সেইজন্যই জপধ্যান-রূপ নানা তপস্যাদির দ্বারা

মনঃসংযম করিবার যাবতীয় বিধান প্রাচীন ঋষিরা দিয়া থাকেন। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জীবনে ধ্যান-জপ-তপস্যাদির চর্চ্চা রাখা খুবই দরকার। নতুবা জীবনে শান্তি পাওয়া যায় না। সবই আছে কিন্তু 'একের দয়া বিনে সব ছারেখারে গেল'। ইহাই সাধারণ মানুষের জীবন।

মহাপুরুষ-জীবনে কিন্তু আমরা এই মনঃসংযমাদি-ব্যাপার গভীরতর ভাবে দেখিতে পাই। ধীরে ধীরে যেমন তাঁহারা সাধনার রাজ্যে অগ্রসর হন, মন উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত সমাধিস্তর পর্য্যন্ত উঠিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সাধকের মন যখন স্তরে স্তরে উঠিতে থাকে, তখন ভাব-দর্শনাদি অনেক রকম হইয়া থাকে। সাধকের আগ্রহে ও ভাবের আবেগে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হইয়া যান; সাধকের সঙ্গে প্রাণভরিয়া কথা বলেন—এই যেমন সাধারণ একজন মানুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আমরা কথা বলি। সাধক মাকে ভোগ নিবেদন করেন, মৃন্ময়ী জীবন্ত হইয়া আদরে-দেওয়া ভোগ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। সাধক-জীবনে এই জাতীয় ঘটনা বহু দেখিতে পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রভাব যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন এই জাতীয় আলোচনা করিতে ভয় হয়। কারণ আমরা বিজ্ঞানের যুগের লোক; চিন্ময়ী মাকে

দূরবীণ-যন্ত্রে ফেলিয়া দেখিতে চাই। নতুবা বিশ্বাস করি না; অর্থাৎ চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইতে পারিলে ভাব দর্শনাদি এই সব মাথার খেয়াল এবং পাগলামি বলিয়াই আধুনিক শিক্ষিতসমাজ ধরিয়া লয়। পাঠক! চোখে আঙ্গুল দিয়া প্রমাণ করিবার সাহস এবং সামর্থ্য রাখি না। কিন্তু মহাপুরুষ-জীবনে অলৌকিক ঘটনাবলী এবং দর্শনাদির কথা আমরা বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে বিশ্বাস ছাড়া উপায় কি আছে? দিব্য দর্শন দিব্য চক্ষু ছাড়া হয় না। মহাপুরুষেরা তপস্যাদির দ্বারা দিব্য চক্ষু লাভ করেন এবং তাঁহাদের দিব্য দর্শন হয়। তাই বলিয়া, রামা শ্যামা যে কেউ দিব্য দর্শনাদির সুবিধা-সুযোগ লইয়া সংসারের সাধারণ মানুষগুলিকে ঠকাইয়া বেড়াইবে, ইহাও বলিতেছি না। আমরা জানি পেট-বৈরাগীর দল সংসারের সহজ সরল মানুষগুলির বিশ্বাসকে মূলধন করিয়া ব্যবসায় খুলিয়া দেয়। ভাবে, সংসারে দেনা পাওনার এমন সহজ উপায় বুঝি আর কিছু নাই।

চোখে আঙ্গুল দিয়া প্রমাণ করিবার সামর্থ্য রাখি না, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতসমাজের লোকের মত মহাপুরুষ-জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকে মাথার খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিবার স্পর্দ্ধাও করি না। কয়লার

খনিতে মণি পাওয়া যায় বলিয়া বাজারে কয়লা এবং মণি একদরে বিকায় না। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এইটুকু যে, মেকি জিনিষ সংসারে আছে বলিয়া খাঁটি জিনিসের আমরা যেন অনাদর না করি।

নিম্নে রামপ্রসাদ-জীবনের কয়েকটী অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষিতসমাজের নিকট এ জাতীয় ঘটনাবলী উল্লেখ করিতে সত্যই সঙ্কোচবোধ হয়। সেইজন্য বিষয়টার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইলাম।

কথিত আছে, রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অর্থাভাবে কিছুতেই তিনি সেগুলি মেরামত করিতে পারিতেছিলেন না। একদিন নিজেই বেড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী অপর পাশে বসিয়া বেড়া বাঁধিবার দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে চলিয়াছে, জগদীশ্বরী পিতাকে না বলিয়াই হঠাৎ কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ কিছুই জানিতে পারিলেন না। কন্যার অবর্ত্তমানেও দড়ি ঠিক ফিরিয়া আসিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে জগদীশ্বরী আসিয়া দেখিলেন, বেড়া অনেকদূর বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দড়ি কে ফিরাইয়া দিলে, বাবা?

কেন মা, তুমিই তো দড়ি ফিরাইয়া দিতেছ— রামপ্রসাদ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

আমি তো অকেনক্ষণ এখানে ছিলাম না, বাবা! অন্য কাজে গিয়াছিলাম।

শুনিয়া রামপ্রসাদ স্তম্ভিত! কে দড়ি ফিরাইয়া দিল! অনেকক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, জগজ্জননী স্বয়ং কন্যারূপে আসিয়া দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিল। মনের আবেগে গান ধরিলেন—

মন কেন মায়ের চরণছাড়া।

ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥
নয়ন থাক্‌তে দেখলে না মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে তনয়া রূপেতে বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥

যখনই রামপ্রসাদ মায়ের সাড়া পাইতেন, আনন্দে বিভোর হইয়া গান ধরিতেন—পাগল হইয়া যাইতেন। অপার্থিব আনন্দে তাঁহার মন যে কোথায় খেলিয়া বেড়াইত, কে জানে?

কথিত আছে, একদিন অল্প-বয়স্কা পরমাসুন্দরী একটী স্ত্রীলোক রামপ্রসাদের গান শুনিতে আসেন। প্রসাদ তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন। সুতরাং

রমণীকে বসিতে বলিলেন। স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটী নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। হঠাৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল এবং এদিক ওদিক তাকাইয়া স্ত্রীলোকটীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। চণ্ডী-মণ্ডপের দেওয়ালে চোখ পড়িতেই দেখিলেন লেখা রহিয়াছে—আমি অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনতে এসেছিলাম। এখন আর অপেক্ষা করতে পারিনে। তুমি কাশীতে গিয়ে আমাকে গান শুনিয়ে আসবে।

দেওয়ালের গায়ে এই কয়টী কথা পড়িয়া রামপ্রসাদ একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন, ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং আসিয়াছিলেন গরীবের কুটীরে গান শুনিতে! কিন্তু স্নান করিবার ঝঞ্ঝাটে রামপ্রসাদ মা অন্নপূর্ণাকে বসাইয়া রাখিলেন! ক্ষোভ ও ব্যথায় তাঁহার হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিল। উপায় নাই, তাঁহাকে কাশী যাইতেই হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া বারাণসীর দিকে রওনা হইলেন। তিনি আনন্দে ভরপূর, মা অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবেন। কিন্তু আর তাঁহার কাশী যাওয়া হইল না। ত্রিবেণীর নিকটে পথিমধ্যে স্বপ্নে দেখিলেন, কাশী যাইতে হইবে না ; সেখানেই গান গাহিলে চলিবে।

তখন রামপ্রসাদ আনন্দে আত্মহারা। ত্রিবেণীর সন্নিকটে বসিয়া মনের আনন্দে বহু গান গাহিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে আপনি বহু গান ঝরণার ধারার ন্যায় বহিয়া আসিতে লাগিল। সাক্ষাৎ সরস্বতী যেন কণ্ঠে বসিয়া গানের পর গান রচনা করিয়া দিলেন। রামপ্রসাদ বিভোর হইয়া গাহিতেছেন ৺মায়ের গান।*

আর একটী অলৌকিক ঘটনার কথা তাঁহার জীবনীতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ কালীপূজার পরের দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময় একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া চারিটী গান রচনা করেন এবং বিভোর হইয়া গাহিতে থাকেন।

কথিত আছে, চতুর্থ গানের শেষ অংশ 'দক্ষিণা হয়েছে' এই কথাটী উচ্চারণ করা মাত্রই তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ভাগীরথী-বক্ষে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রামপ্রসাদের জীবনে আরও অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনার কিংবদন্তী আছে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ না পাওয়ায় সেগুলি আর এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল না। অন্যান্য অধ্যায়ে সামান্য দুই-একটি এ জাতীয় ঘটনার উল্লেখ আছে মাত্র।

---

* এই ঘটনাটীও কয়েকটী প্রসাদ-সঙ্গীত হইতে পাওয়া যায়।

সাধক-জীবনে, সাধনার রাজ্যে মন যখন একেবারে লীন হইয়া যায়, তখন এ জাতীয় অলৌকিক দর্শনাদি হয় তো অনেক হয়, কে তাহার খবর রাখে! সাধক নিজেও তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া যান না। সেই-জন্য আমাদের নিকট আর একটী বিরাট জগতের খবর যেন প্রহেলিকা মাত্র। গীতায় আছে—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"

--অর্থাৎ সর্ব্বভূতের নিকট যাহা নিশা বা অন্ধকার বলিয়া মনে হয়, সংযমী পুরুষের সেইটাই হইল জাগ্রত অবস্থা। সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিরাট জগতের সংবাদ অজ্ঞাত; কিন্তু মহাপুরুষগণ দিব্যচক্ষে সেই জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যাপার দেখিতে পান।

মহাপুরুষ-জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকে শুধু শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই।

সাধনা ও দিব্যভাব

পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া রামপ্রসাদ কঠোর সাধনায় মগ্ন; আহার-বিহার পর্য্যন্ত ভুল হইয়া গেল, প্রায়ই বাড়ীতে আসেন না। দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজে আর তাঁহার মন লাগে না। গরীব সংসারে মাতা সর্ব্বেশ্বরী কোন উপায়ে

সংসার চালাইয়া যান। রামপ্রসাদ তাহার সংবাদও রাখেন না। কঠোর সাধনা করিয়া ধীরে ধীরে তিনি মনকে জগৎ হইতে অনেক উপরে উঠাইয়া ফেলিয়াছেন। লোকজন কেহ সাধনার স্থানে—পঞ্চমুণ্ডীর আশেপাশে যাইতে ভয় করিত। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে গান শুনিবার জন্য তথায় আসিতেন। রামপ্রসাদ নিত্য নূতন মায়ের-গান রচনা করিয়া গাহিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন—রামপ্রসাদ এ জগতের মানুষ নহেন। তাঁহার দিব্য ভাব, দিব্য কান্তি দেখিয়া মহারাজ মনে করিতেন, দেবলোক হইতে দেবর্ষি নামিয়া আসিয়াছেন। রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে মহারাজের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেন; কিন্তু একটুখানি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, মন তাঁহার এ জগতে নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অবাক হইয়া ভাবিতেন – এ কি অবস্থা! অনেক সময় তাঁহার কথাবার্ত্তার কোন সামঞ্জস্য নাই, সাধারণ লোকে পাগল বলিয়াই মনে করিবে। কথাটীও সত্য। বাউলা হইয়া গিয়াছেন। পোষ্য স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভরণ-পোষণাদির ভাবনা পর্য্যন্ত তাঁহার একেবারে লোপ পাইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে কর্ত্তব্যের গুরুতর অবহেলা! কিন্তু সংসারের সাধারণ মাপকাঠির নিক্তির ওজনে সাধকগণকে ওজন করা যায় না। সাধক-জীবন

সাধারণ নিয়মের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়। দিব্যোন্মাদের এই রীতি, এই নিয়ম।

মাঝে মাঝে হয়তো কখনও বাড়ীতে আসিয়াছেন। দারিদ্র্যের পীড়নে পত্নীর দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য হয়তো তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু যখনই পুনরায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে গিয়াছেন, তখনই সব ভুল হইয়াছে। স্ত্রীপুত্রপরিবার—কে কাহার? কঠোর সাধনার সময় রামপ্রসাদের দিনগুলি এইভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। রামপ্রসাদ তিথি, নক্ষত্র ও বার ভুলিলেন। ৺মায়ের নামে তিনি ডুবিয়া গেলেন।

এই সময় তাঁহার স্বভাব একেবারে বালকের মত হইয়া গেল। তিনি যেন পাঁচ বৎসরের বালক। শাস্ত্রে আছে, যখন সাধনার উচ্চস্তরে মন উঠে তখন সাধকের মন উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ অথবা বালকবৎ হইয়া যায়। রামপ্রসাদেরও আজ সেই অবস্থা। সবদিকে সমদৃষ্টি, ভাল-মন্দের জ্ঞান নাই, সাধারণ জগতের লাভ-লোকসান ছোট-বড় প্রভৃতি নিক্তির ওজনে হিসাব-করা জিনিসের প্রতি আজ তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। নির্ব্বিকল্প সমাধিস্তরে সাধকের মন না গেলে এ অবস্থা হয় না। সাংসারিক কাজকর্ম্ম রামপ্রসাদের

একেবারেই ভুল হইয়া গেল। পরিবারের সকলে তাঁহার এই উচ্চ অবস্থা লক্ষ্য করিলেন এবং সংসারের যাবতীয় ভার নিজেরা গ্রহণ করিলেন। তুচ্ছ সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে তাঁহাকে আর মোটেই আসিতে হইল না। পুত্র রামদুলালও বুঝিলেন, এই অবস্থায় পিতাকে সামান্য তুচ্ছ জিনিসে কষ্ট দেওয়া বৃথা বিড়ম্বনা। প্রসাদ ধীরে ধীরে এ জগৎ ভুলিলেন। অন্তর্জগতের পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া তাঁহার দিনগুলি দিব্য আনন্দে কাটিয়া যাইত। সংসারের কেন দায়িত্ব তাঁহার নাই, রামপ্রসাদ আজ উদাসীন বালকের মত সহজ, সরল। এই সময় বহু লোক তাঁহার কাছে গান শুনিতে আসিত। মিস্ট ব্যবহারে তিনি সকলকেই আদর-আপ্যায়ন করিতেন এবং মায়ের সুমধুর গান শুনিয়া সকলেই নিজকে ধন্য মনে করিত।

মায়ের মৃত্যু

এই সময় হইতে প্রসাদের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার দেহের দিব্য কান্তি এবং কবিত্ব-শক্তির অদ্ভুত স্ফুরণ—এই দুই একসঙ্গে মিলিত হইয়া বহু লোককে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা জননী সিদ্ধেশ্বরী সর্ব্বদা তাহার পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতেন। প্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে দেখিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র মায়ের নাম-গানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, সংসারের সংবাদও রাখেন না। বৃদ্ধা জননী সাধ্যানুযায়ী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিতেন—তবুও রামপ্রসাদের সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং বার্দ্ধক্যহেতু নানাপ্রকার জটিল ব্যাধিতে তাঁহার শরীর আক্রান্ত হইয়া পড়িল। রামপ্রসাদ চিন্তান্বিত, জননীর পীড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রসাদের স্ত্রী সর্ব্বাণী শাশুড়ীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন ; কিন্তু কোনও ফল হইল না। প্রসাদের গর্ভধারিণী ইস্টনাম করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর প্রসাদের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সদা সর্ব্বদা উদাসীন ভাব। পিতার মৃত্যুতে তাহার জীবনে বিপর্যয় আসিয়াছিল, ক্ষুদ্র সংসারের বোঝা বড়ই ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর অবস্থা ঠিক বিপরীত দাঁড়াইল। যেন সংসারের কোন দায়িত্বই আজ তাহার নাই। ইহার অস্তিত্ব আছে কি

না সন্দেহ! অথচ স্ত্রী পুত্র পরিবার সবই বিদ্যমান। সংসার ধীরে ধীরে বড় হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃবিয়োগে দৈনন্দিন কাজে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য পরিলক্ষিত হইল। স্নেহময়ী জননীর ভালবাসার কোমল বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়িয়াছিলেন। আজ হঠাৎ সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে রামপ্রসাদ একেবারে উদাসীন হইয়া উগ্র তপস্যায় মাতিয়া উঠিলেন। ইহার পরই একদিন অমাবস্যা তিথিতে গ্রামের নিকটস্থ শ্মশানে* যাইয়া তিনি শবসাধনায় নিযুক্ত হইলেন। সমগ্র অমানিশিতে কি কাতর প্রার্থনা -- মায়ের নিকট কি করুণ মিনতি! কথিত আছে, বরাভয়করা আদ্যাশক্তি মহামায়া এই অমানিশার সাধনায় তুষ্ট হইয়া প্রসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গর্ভধারিণীর অভাবে প্রসাদের সংসার শূন্য হইয়া গিয়াছে। কোনও বোঝা, ভার, দায়িত্ব তাঁহাকে সংসারে আকর্ষণ করিতে পারিল না। নিভৃত নির্জ্জনে তাঁহার সিদ্ধাসনেই তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত

---

* কেহ কেহ বলেন, রামপ্রসাদের এই শবসাধনা 'বড়তির বিলে' হইয়াছিল। স্থানটী চব্বিশ-পরগণায় শ্যামনগর ও ইছাপুরের মধ্যে অবস্থিত। প্রসাদের জীবনের ইহাই প্রধান কার্য্য—ইহার উত্তর সাধক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী।

করেন। বিশেষতঃ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, একাদশী, মঙ্গলবার, শনিবার প্রভৃতি বিশেষ দিনে এবং বিশেষ তিথিতে তিনি আহার ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মায়ের নাম ও ধ্যান করিতেন। সিদ্ধাসনে বসিয়া কি উগ্র তপস্যা!

সাধনার রাজ্যে রামপ্রসাদ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। একটু বেশী করিয়া মন স্থির করিলে দেখিতে পাইতেন—মূর্ত্তিমতী মা কালীরূপে হাস্যবদনে দাঁড়াইয়া! বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্ত্তি! এই সময় প্রায়ই তাঁহার মাতৃ-দর্শন হইত। সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি মাতৃময় দেখিতেন। আসনে বসিলেই ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। তাঁহার নিজের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া তিনি সর্ব্বস্ব মায়ের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

আজু গোঁসাই ও রামপ্রসাদ

সমসাময়িক এবং স্বগ্রামবাসী আজু গোঁসাইয়ের বিষয় কিছু না বলিলে রামপ্রসাদের জীবনের একটী অধ্যায় অপূর্ণ থাকিয়া যায়। আজু গোঁসাই বিশেষ স্বনামধন্য পুরুষ নহেন। তাঁহার বংশধরেরা আজ বাঁচিয়া নাই। কিন্তু রামপ্রসাদ-জীবনের পাশা-পাশি তিনি এমন ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, সাধকের সঙ্গে তিনিও অমর হইয়া গিয়াছেন।

হালিশহর গ্রাম প্রধানতঃ শাক্ত-প্রধান স্থান বলিয়াই বিখ্যাত। কিন্তু এখানে বৈষ্ণবদেরও যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বিশেষ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গুরু শ্রীঈশ্বর পুরীরও এই গ্রামে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সময় সময় এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে পরিহাস চলিত, নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক বাদ-বিবাদ হইত। বৈষ্ণবেরা শাক্তদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ছড়া গাঁথিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। শাক্তরাও তাহার প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর করিতেন। যদিও পরস্পরের মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপাত্মক গান-রচনাদি হইত, তাহা হইলেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সত্যকার বিবাদ ছিল না। রামপ্রসাদ কখনও বিরোধী ভাব রাখিতেন না। তাঁহার নিম্নলিখিত গান হইতে ইহা বুঝা যায় –

"মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজতালাসি।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ, শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী-বাসী, অযোধ্যা-গোকুলনিবাসী ;
ভৈরবী ভৈরবসঙ্গে শিশুসঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকীসঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥"

রসিক বৈষ্ণব আজু গোঁসাই সময় সময় বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করিতেন। তাহার আসল নাম যে কি ছিল কেহই বলিতে পারে না। অযোধ্যানাথ গোঁসাই, অচ্যুত গোঁসাই, রাজু গোঁসাই ইত্যাদি বিভিন্ন নাম নানা লোকে বলিয়া থাকে। রাজু গোঁসাইকে আজ গোঁসাই বলিয়া ডাকিত এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন গ্রাম্য কবি, ছড়াগান গাঁথিবার তাঁহার অদ্ভুত শক্তি। অদ্ভুত পরিহাস, রসিকতা, উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করিবার বিশেষ ক্ষমতা এবং কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্যও তাঁহার ছিল। রামপ্রসাদের গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রসিক বৈষ্ণব আজু গোঁসাই সাধকের গানের বিকৃত অর্থ করিয়া পরিহাসচ্ছলে নানাবিধ গান ও ছড়াতে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁহার বিরচিত এ জাতীয় গান বহু ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ তাহার প্রায় সবই বিলুপ্ত। বিদ্রূপাত্মক গান

বলিয়া কেহই এই গান মনে করিয়া রাখে নাই। সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া জানিত। অদ্ভুত-প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষটী, হাসে কাঁদে নাচে গায়, বাহ্যিক ব্যবহার ঠিক পাগলেরই মত। অথচ এই পাগলামির মধ্যেও মাঝে মাঝে অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি এবং উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ভাবও ফুটিয়া উঠিত। সেইজন্য মনে হয়, আজু গোঁসাই সাধক-পুরুষ ছিলেন। পাগলামির ভান করিয়া তিনি সদানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের গান শুনিতে এই গ্রামে আসিতেন। আজু গোঁসাই মহারাজের আগমনের সংবাদ পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেন। রামপ্রসাদ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া মায়ের নাম করিতেছেন। আজু গোঁসাই তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপ করিয়া সেই গানের জবাব দিতেছেন। মহারাজ বিদ্রূপাত্মক গানের মধ্যে অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহার গান আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিতেন। আজু গোঁসাই দ্বিগুণ উৎসাহে নানাবিধ গান রচনা করিয়া রামপ্রসাদের জবাব দিতেন। ভাবের ব্যাঘাত হইত বলিয়া রামপ্রসাদ বিরক্ত হইতেন। একদিন পাগলকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ বলিলেন, "কর্ম্মের ঘাট, তৈলের কাট আর পাগলের ছাঁট—ম'লেও যায় না।" পাগলের ছাঁট আজু

গোঁসাইকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। আজু গোঁসাই বেশ বুঝিতে পারিলেন। প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কর্ম্মের ডোর, স্বভাব চোর, মদের ঘোর—ম'লেও ঘুচে না।"

মদের ঘোর—এই কথা রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন। কারণ তিনি মাঝে মাঝে সুরাপান করিতেন।

যে কয়টী গান সংগ্রহ করা গেল, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। শুধু এক পক্ষের গান দিলে বিষয়টী বুঝা যাইবে না; সেইজন্য রামপ্রসাদের গানের পরে আজু গোঁসাইয়ের বিদ্রূপাত্মক প্রত্যুত্তরও দেওয়া গেল। আজু গোঁসাইয়ের সম্পূর্ণ গান পাওয়া যায় না। তাই স্থানে স্থানে দুই-চারিটী লাইন ব্যতীত বিশেষ কিছু দেওয়া গেল না। কিন্তু ইহাতেই ইঁহার কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন—দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন নিলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহারলোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥

রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে॥"

ইহার প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই গাহিয়াছিলেন—

"ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার ক'ফেনাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বরজাড়ি, মন। যেতে হবে যমের বাড়ী॥
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ডুবিস্‌নে মন, ধর্‌গে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী॥"

রামপ্রসাদের আর একটী সুন্দর ভাবাত্মক গান নিম্নে দেওয়া গেল —

"মন রে, আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে, করবে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শোন্ যুকতি।
ওরে, বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি॥"

আজু গোঁসাই ইহার উত্তরে এই গান করিলেন—

"হ'য়ো না মন পড়া পাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥
পাখী হ'লে তত্ত্ব ভুলে, দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি, পরম তত্ত্বের জানিবে কি ॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর, শমন-ব্যাধে দিবে ফাকি ॥"

রামপ্রসাদ আর এক সময়ে গাহিয়াছিলেন—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়ে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞানখড়েগ বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে, এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর! মনের
মতন মনটী হবি ॥”

এই সঙ্গীতটী অতি সুন্দর; গোস্বামীর রচিত নিম্নলিখিত ব্যঙ্গানুকৃতিও তদনুরূপ হইয়াছে—

“কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন, নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোকে করতে পারিস্, মাঝ গঙ্গাতে
ভরাডুবি ॥
বাঁশবনে গিযে ডোম কাণ হয়, এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে, কি ফল নিতে
কি ফল নিবি ॥”

রামপ্রসাদের আর একটী সঙ্গীত এই –

“এ সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী ॥

গর্ভে যখন যোগী তখন—ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদ্‌পুরুষের আদ্ মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা হয়, তাই কর মা, তুমি তো পাষাণের বেটী॥”

এই গীতের প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই নিম্নলিখিত গানটা রচনা করেন

“এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাইদাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন, মন করবে পরিপাটি॥
ওহে সেন, নাহি জ্ঞান—বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে, ভাই বন্ধু দারা সুতে, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥
রমণীরে বিষ ভেবেছ, তাতেও তো না দেখি ত্রুটি।
তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা, কাঁচিয়েছ পাকা ঘুঁটি॥
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া, ভাব্‌ছ মায়ার বেড়ি কাটি।
তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামা মায়ের চরণ দুটী॥”

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ একবার গাহিয়াছিলেন—

“এবার কালী তোমায় খাবো।
(খাবো খাবো গো দীন দয়াময়ী।)
তারা, গণ্ডযোগে জন্ম আমার।

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার
একটা করে যাব ॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে ক'ষে, সেই কালী
তার মুখে দিব ॥
খাবো খাবো বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাবো।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাবো।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীরপতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥"

এই গান শুনিবামাত্র গোস্বামী গাহিলেন—

"সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ওযে রক্তবীজের বংশ খেলে, তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি?
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে, ভূষোকালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা, নিজে যে কলা দেখিবি ॥"

উপরের গানের কয়েকটা লাইন হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, আজু গোঁসাইয়ের রচনা-শক্তি কতটা প্রখর ছিল। সহজ সরল ভাষা, অদ্ভুত বিদ্রূপের ভঙ্গী এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এক সঙ্গে মনোরম ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, আজু গোঁসাইয়ের সব গানগুলি পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে, বাংলা ভাষার এক অপূর্ব্ব সম্পদ লাভ হইত ও শ্রীবৃদ্ধি হইত, সন্দেহ নাই।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গানের মধ্যে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া মাঝে মাঝে উল্লেখ আছে। এই দ্বিজ রামপ্রসাদ যে কে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। কেহ কেহ বলেন, পূর্ববঙ্গে রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ প্রসাদীসুরে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সেই সব গান কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গান বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে কেহ ছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাসে পাওয়া গেলনা। অথচ গানগুলির রচনাভঙ্গী এবং ভাষা দেখিলে, এগুলি রামপ্রসাদের গান বলিয়া মনে হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, দ্বিজ রামপ্রসাদ কলিকাতারই অধিবাসী, রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামে একজন কবি, অনেকগুলি প্রসাদী সঙ্গীত ও কবিগান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর একটি কবির দল ছিল। নীলমাধব কবিওয়ালা-মহলে নীলু ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। এই নীলু ঠাকুরের দলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নানাবিধ গান রচনা করিতেন।

তিনি সঙ্গীত রচনা করিতেন বটে, কিন্তু গান গাহিতে জানিতেন না। সেইজন্য বিপক্ষ দল মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেমনি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটী টিন॥"

এই রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী খুব সম্ভব সন ১১৬০ কিংবা ১১৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সন ১২৪২ সালে পরলোকগত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলু ঠাকুরও ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীর হেদুয়া পুষ্করিণীর পাশে নীলু এবং রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ছিল। ইঁহাদিগের দৌহিত্র-বংশধরেরা পরে অনেক দিন ধরিয়া কবির দল চালাইয়াছিলেন।* চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের তিরোধানের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রসাদী গানের অনুকরণ করিয়া বহু গান রচনা করেন। এই ভাবে উভয়ের গান এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন পৃথক্ করা

* ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবি ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' নামক একখানি পুস্তক আছে। সেই গ্রন্থে নীলু, রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, রাম বসু, রামসুন্দর সেকরা, হরু-ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতির কিছু কিছু ইতিহাস বর্ণিত আছে। এই কবিসংগ্রহ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন পুস্তকালয়ে হয়তো আছে।

দুঃসাধ্য। অনেকগুলি প্রসাদী গানে ডিক্রী, ডিস্‌মিস্‌, আপীল প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ দৃষ্ট হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দের ততটা প্রচলন সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য মনে হয়, এই জাতীয় গানগুলি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নহে—চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদের। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ উপরে দেওয়া গেল। সঠিক করিয়া কিছু বলা কঠিন।

তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ এই দুই লইয়া মানুষের জীবন। প্রবৃত্তিমার্গ মানুষকে ভোগের দিকে লইয়া যায়। নশ্বর জগতের যাবতীয় ভোগসুখ সম্ভোগ করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে নিম্নগামী হইয়া থাকে এবং পরিণামে ইহা হইতে বিষময় ফল উৎপাদিত হয়। নিবৃত্তিমার্গ মানুষকে ধীরে ধীরে বৈরাগ্যের পথে লইয়া যায় এবং দুদিনের সংসারের সুখভোগ যে অতি তুচ্ছ, তাহার উপলব্ধি করাইয়া দেয়। এই দুইটী বৃত্তি মানুষের মধ্যে সদা বিরাজমান থাকে। মানুষের ভিতরে অহরহঃ দেবাসুরের যুদ্ধ চলিয়াছে। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, এই যুদ্ধে অসুর বিজয়ী এবং দেবতা পরাজিত হন, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মন নিবৃত্তিমার্গে

যাইতে চায় না, ঐহিক সুখভোগ লইয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িয়া থাকে। মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য—বৈরাগ্যের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া; কারণ ইহাতেই মানুষের চিরকাম্য অনন্ত সুখলাভ হয়। জীবনে মানুষ সুখ চায়, কেহ দুঃখ চায় না। কিন্তু উপায় জানে না বলিয়া বৃথা সুখান্বেষী হইয়া কুপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবনে সাধনার দ্বারা যাঁহারা এই দেবভাবরূপ নিবৃত্তিমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারাই শুধু প্রবৃত্তিমার্গরূপ অসুর ভাবকে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা জগতে অতি মুষ্টিমেয়। অনুভূতি সম্পন্ন প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাহারা মানুষের মনকে নানাভাবে যাচাই করিয়া দেখিলেন যে, নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ মানুষ সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্য ধীরে ধীরে যাহাতে মানুষ নিবৃত্তিমার্গে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য সকাম প্রবৃত্তিমার্গের সাধনাদির উপদেশ তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন। যেমন বেদে আছে—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব-ভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে হিংসা বা বধ করিবে না। কিন্তু আবার দেখা যায় সেই বেদেই আছে—"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত", অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে পশু বিনাশ করিবে, অর্থাৎ পশুবধ করিয়া অগ্নীষোম দেবতার যাগ করিবে। যজ্ঞে পশুবধ করা বৈদিক বিধান। অহিংসা

মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বুঝিলেন, সাধারণ মনুষ্যসমাজে এ বিধির বিধান করিলে কেহই মানিয়া লইতে পারিবে না। কারণ মানুষের সাধারণ স্বভাবই হইল অপরকে হিংসা করা। সংযত ভোগের সাহায্যে ধীরে ধীরে মানুষকে বৈরাগ্যের পথে লইয়া যাওয়াই উদ্দেশ্য। সেইজন্য বেদে আমরা এত সকাম উপাসনার বিধান দেখিতে পাই। দশাশ্বমেধাদি নানাবিধ যজ্ঞ ও প্রায়শ্চিত্তাদি সকাম উপাসনার পরিচায়ক। ইহাদের মধ্যে সাধনাদির ব্যবস্থা থাকাতে মানুষের প্রবৃত্তিকে ধীরে ধীরে সংযত করিয়া লওয়া হয়।

কলিযুগে যখন বৈদিক সাধনা ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল, তখনই তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হইল। মহানির্ব্বাণতন্ত্র নামক বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থে এই সাধনাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার আছে। তান্ত্রিক সাধনাদিতেও আমরা দেখিতে পাই, সংযত ভোগের সাহায্যে ধীরে ধীরে মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস রহিয়াছে। তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চমুণ্ডীর*

* ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥ ৫১
নর-মহিষ-মার্জ্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২

আসন নির্ম্মাণ করিয়া সেই আসনে বসিয়া মায়ের উপাসনা করাই প্রথম বিধি।

এই সাধনায় প্রধানতঃ পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা রহিয়াছে। সেইজন্য ১ম, ২য় বা ৩য় ভাবে ভগবৎ-আরাধনা করিবার জন্য উপদেশ আছে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতিভেদে ভাব ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তামসিক ও রাজসিক স্বভাবসম্পন্ন লোক পশু ও বীর-ভাবেই সাধনা করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-ভাবাপন্ন সাধক দিব্যভাবেই সাধনা করেন। গুরুর উপদেশ অবলম্বন করিয়া প্রথমে পশুভাবে সাধনা করিতে হয়। ইহাতে যোগ-শিক্ষাই প্রধান। যোগের দ্বারা মন উন্নত হইলে, বীরভাবের সাধনা আরম্ভ

শিবসর্পসারমেয়বৃষভাণাং মহেশ্বরী।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি কীর্ত্তিতম॥ ৫৩
অথবা পরমেশানি নরাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈবচ॥ ৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরী।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে॥ ৫৫
বিতস্তিপ্রমিতাং দেবীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আযামপ্রস্থতো দেবী চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ॥ ৫৬

—যোগিনীতন্ত্রম্, পঞ্চম পটল।

হয়। বীরভাবের সাধক আর ইন্দ্রিয়ের দাস থাকেন না। তাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা সংসারে বিচরণ করিতে পারেন। তাঁহার পতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। দিব্য-ভাব এই বীরভাবেরই চরম উৎকর্ষ। সাধক দিব্যভাবে উপনীত হইলে সমদর্শী হন। তখন ভেদাভেদ আর কিছু থাকে না। তিনি সুখদুঃখের অতীত আনন্দময় মহাপুরুষ।

পঞ্চ ম-কার-উপাসনাই তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অঙ্গ। পঞ্চ ম-কার * অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য, মৈথুন।

* (মদ্য)—সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥
(মাংস)—মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥
(মৎস্য)—গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥
(মুদ্রা)—সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্।
সূর্য্যকোটীপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটীসুশীতলম্।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলীসংযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥
(মৈথুন)—মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

বীরাচারী সাধক গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া উহা উপভোগ করিবার অধিকারী হন। কঠোর সংযম অবলম্বন করিয়া উপরে বর্ণিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেই ফল প্রত্যক্ষ হইবে। নতুবা, পতনের সম্ভাবনা অত্যধিক।

এই বাহ্যিক পঞ্চ ম-কারের সাহায্যে আধ্যাত্মিক পঞ্চ ম-কারের আস্বাদলাভ করিতে হয়। বীরাচারী সাধক ষট্‌চক্রভেদ করিয়া বীজ ও শক্তিকে প্রসন্ন করিতে পারেন। এইভাবে সহস্রার পদ্মে উপনীত হইতে পারিলেই শিব হইয়া যান। এই সহস্রার বা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সুধা ক্ষরিত হয়, তাহাই মদ্য নামে অভিহিত। এই অবস্থায় সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়—কোন ভেদাভেদ থাকে না। এই মদ্য তাঁহার পানীয়। সাধক তখন ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। এই সময় কথাবার্ত্তা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। এই বাক্যসংযমকেই মাংস ভক্ষণ বলে। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে রজঃ ও তমঃ-রূপ শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রাণায়াম দ্বারা নিরোধ করিতে হয়।

> বেদাস্তু কুসুমাভাসং, কুণ্ডমধ্যে অবস্থিতো,
> ম-কারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
> আকার হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ,
> তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

ইহাকেই মৎস্য ভক্ষণ বলে। সহস্রদল পদ্মে জ্যোতিবিশিস্ট আত্মাকে জানাকেই মুদ্রা বলে। নাভিচক্রস্থিত অজপারূপ শ্বাসপ্রশ্বাস ও আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির সহিত মিলনের নাম মৈথুন। ইহাই আধ্যাত্মিক পঞ্চ ম-কার। রামপ্রসাদের গুরু সাধক আগমবাগীশ ষট্‌চক্রভেদরূপ * যোগও তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

---

* ষট্‌চক্র—"মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গন্তু কোটীসূর্য্যসমপ্রভং॥
তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু কলশান্তীন্দুনাদকম্।
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা॥
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং বসবর্ণ চতুর্দলম্।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ॥
তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্।
বাদিলান্ত ষড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্॥
মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ।
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ॥
তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরং মহৎপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ॥
মণিবদ্ভিন্ন তৎপদ্মং মণিপুরং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদি ফান্তাক্ষরান্বিতম্॥
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বালোকৈককারণম্।
তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥

রামপ্রসাদ এইরূপে ষট্‌চক্রভেদ-বর্ণনাচ্ছলে গাহিতেন—

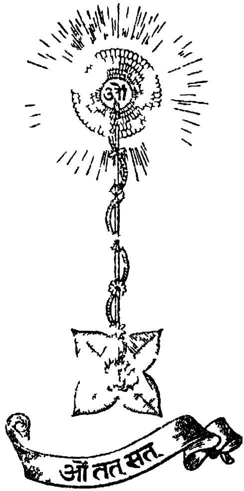
"আমার মনের বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে, সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী।
মূলে পৃথ্বী ব, স অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী।
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল অন্তে ষড়দলোপরবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী।
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নিবীজধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দ্বিদলে, শিব, ভৈরবী লাকিনী।
অনাহতে ষট্ কোণে দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী।

কাদিঠান্তাক্ষরৈর্বর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্॥
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে।
তেনানাহতাখ্যং পদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্।
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্।
স্বরৈ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈর্মহৎপ্রভুম্।
বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাং জীবস্থ হংসলোকনা।
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্॥
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্টিতং পরম্।
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতম্॥

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী।
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে, হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী।"

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আদ্যাশক্তি মহামায়া কালীর সাধনা করিতে হইলেও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়। যোগিগণ বলেন, মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী আছে। শরীরস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না অবস্থিত। নাড়ী সন্নিবেশের সমষ্টি বা আবর্ত্তকে নাড়ীচক্র কহে। নাড়ীর ছয়টী চক্র আছে। সুষুম্না মূলাধার অর্থাৎ গুহ্যদেশ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কুণ্ডলীকৃত হইয়া মূলাধারে সুষুম্না অবস্থিত। প্রাণায়ামের সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া ধীরে ধীরে যখন উপরের চক্রে উঠিতে থাকে, তখন সাধক নানাবিধ বিভূতিসম্পন্ন হন এবং প্রাণে অপার আনন্দ উপভোগ করেন। পরে যখন কুলকুণ্ডলিনী মস্তকে আসিয়া উপনীত হন, তখনই সাধক যোগসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। যোগিগণ প্রাণায়ামদ্বারা এবং তান্ত্রিকগণ পঞ্চ ম-কার-সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া উঠাইতে পারেন।

নাড়ীর যে ছয়টী চক্র আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—(১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর, (৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ ও (৬) আজ্ঞাচক্র।



ষট্‌চক্র

(১) মূলাধার—মূলাধার গুহ্যদেশে অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দল। ইহাতে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিত। তাহার সুধাক্ষরণ-স্থলে মুখ সংলগ্ন করিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন।

(২) স্বাধিষ্ঠান—ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত। শ্বেতবর্ণ ষড়্‌দলপদ্ম, তাহাতে বরুণদেব ও বারুণীশক্তি অবস্থিত।

(৩) মণিপুর—ইহা নাভিমূলে অবস্থিত। রক্তবর্ণ দশদল পদ্ম। তন্মধ্যে অগ্নিদেব ও সাকিনীশক্তি বিরাজিত।

(৪) অনাহত—হৃদয়ে অবস্থিত। ধূম্রবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম। তাহাতে বায়ুদেব ও কাকিনীশক্তি অবস্থিত।

(৫) বিশুদ্ধ—কণ্ঠদেশে অবস্থিত। নীলবর্ণ ষোড়শ-দলবিশিষ্ট পদ্মে শিব ও সাকিনীশক্তি অবস্থিত।

(৬) আজ্ঞাচক্র—ভ্রূ-মধ্যে অবস্থিত। পীতবর্ণ দ্বিদলযুক্ত পদ্মে শিব লিঙ্গরূপে হাকিনীশক্তি সহ বিরাজিত। এই পদ্মের কিঞ্চিৎ উপরেই প্রণবাকৃতি পরমাত্মার স্থান। উহাই সহস্রার পদ্ম। তাহাতে পরম শিব অবস্থিত।

উপরি উক্ত সুষুম্নার মধ্যে ষট্‌গ্রন্থী ষট্‌চক্র নামে অভিহিত এবং সহস্রার স্বতন্ত্র পদ্ম। শরীরের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান। ইড়া ও পিঙ্গলা তাহার সহ-চারিণী। এই দুই নাড়ী শুক্র-শোণিত-সমুদ্ভূতা। ইহারা ব্রহ্মরূপিণী সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হইয়া ক্রমশঃ ষট্‌চক্র অতিক্রম করিয়া সহস্রারে ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হন। ইহাই ষট্‌চক্রভেদ। ইহাই প্রধান যোগ। রামপ্রসাদ এই যোগসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চ ম-কার-সাধনার নির্দ্দেশ দেখিয়াই আমরা

বুঝিতে পারি, আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন মুনি-ঋষিরা কলিযুগে সংযত ভোগের মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে যাহাতে মানুষ নিবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হয় তাহারই প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষের স্বভাব সাধারণতঃ অতীব উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল; কিছুতেই বশ মানে না। মদ্যে, মাংসে যাহার অত্যন্ত অভিরুচি, সংযতভাবে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া ভোজন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধীরে ধীরে সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বশে আসিতেছে।

গুরুর উপদেশমত কঠোর সংযমী হইয়া এই সাধনায় অগ্রসর হইতে হয় এবং ইহাতেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়। তান্ত্রিক সাধনার ইহাই চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে এই সাধনা অতি সাধারণ ভণ্ড লোকের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা শুধু ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য এই সাধনা অবলম্বন করে এবং এইজন্যই আধুনিক সমাজে তান্ত্রিক সাধনার নানাবিধ নিন্দাবাদ আমরা শুনিতে পাই। বাস্তবিকপক্ষে, সদ্‌গুরুর উপদেশ-অনুসারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মিক সিদ্ধির ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। সংযত ভোগ ব্যতীত সাধারণ মানুষের উপায় নাই।

সাধক রামপ্রসাদ এই তান্ত্রিক সাধনাই আজীবন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে চরম সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার

গুরু সাধকচূড়ামণি আগমবাগীশের উপদেশে তিনি এই সাধনায় অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বাহ্যিক পঞ্চ ম-কার-অবলম্বনে সাধনা আরম্ভ করেন। প্রায় ৮।১০ বৎসর তাঁহার নির্জ্জন উদ্যানে বসিয়া এই বীরভাবের সাধনা করেন। এই সময়ে তিনি লোকের সঙ্গে মোটেই কথা বলিতেন না। অহর্নিশি মায়ের নামে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। পরে ধীরে ধীরে তিনি বীরভাবের সাধনা করিয়া দিব্যভাবে উপনীত হন। বরাবরই আমাদের সমাজে মদ খাওয়া অতি হেয় বলিয়া গণ্য হইত। সেইজন্য রামপ্রসাদ গান রচনা করিয়াছিলেন—

"সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
(আমার) মন-মাতালে মাতাল করে,
(যত) মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।"

প্রসাদ-প্রসঙ্গে তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটী কথা বলা হইল। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কুলাচার প্রভৃতি আচারের অনুমোদিত উপাসনা ও প্রক্রিয়াদি বহু আছে। সে সব

কথা তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক সাধকদের নিকট সম্পূর্ণভাবে জানা যাইতে পারে।

বংশ-পরম্পরায় তান্ত্রিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রসাদ-পরিবারে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এ সাধনা তাঁহার মজ্জাগত। অতি সহজে যে তিনি ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া এবং শুধু পাণ্ডিত্যের চর্চ্চা করিয়া সাধনার বিষয় উপলব্ধি করা এক দুরূহ ব্যাপার। সাধক ব্যতীত সাধনার রাজ্যের দুরূহ ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

পতিব্রতা সর্ব্বাণী

সাধক রামপ্রসাদ সাধনায় ব্যস্ত। ঘরকন্নাদি দেখিতেন মাতা সিদ্ধেশ্বরী। আপন-ভোলা সন্তানের প্রতি চাহিয়া তিনি সংসারের যাবতীয় ভার লইয়াছিলেন। জানিতেন, রামপ্রসাদের দ্বারা এ সংসারের কাজ কিছুই হইবে না; বুঝিতেন—মা-নামে পাগল সাধককে সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য অযথা বিরক্ত করা সমীচীন নহে। প্রসাদের সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বাণী অতীব বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী সাধারণ সংসারের মানুষ নহেন। যদিও মুখ ফুটিয়া কখনও কিছু বলিতেন না, কিন্তু হৃদয়ে

এক অপূর্ব্ব গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করিতেন। সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তিনি পান নাই, আশাও করেন নাই। সুতরাং অভাবের যাবতীয় খুঁটিনাটি সাধারণ মেয়েমানুষের মত বড় করিয়া ধরিবার স্বভাব তাঁহার ছিল না। তাঁহার চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতা, স্বাভাবিক সহৃদয়তা এবং শান্তিপ্রিয়তা শাশুড়ীকে আনন্দ দান করিত। তিনি বুঝিতেন, চিরসহিষ্ণু তাঁহার আদরের বধূমাতাটী কখনও নালিশ জানায় না। তাহাতে হৃদয়ের গভীর উৎস হইতে দ্বিগুণ ভালবাসা আপনি উছলিয়া উঠিত। রামপ্রসাদ মায়ের নামে বিভোর! সিদ্ধাসনে কঠোর তপস্যায় মগ্ন! কিন্তু গর্ভধারিণীর গভীর আকর্ষণে তাঁহাকে বাড়ীতে আসিতে হইত। সংসারের খোঁজ-খবরও মাঝে মাঝে লইতে হইত। সন্তান-বিহনে জননী দুটী দিনও থাকিতে পারিতেন না। ধীরে ধীরে জগজ্জননী রামপ্রসাদের এই আকর্ষণও ঘুচাইয়া দিলেন। গর্ভধারিণীর মৃত্যুতে তাঁহার যেন কোন বন্ধনই আর রহিল না। সিদ্ধাসনে বসিয়া কি যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শাশুড়ীর মৃত্যুতে পতিব্রতা সর্ব্বাণীর কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তাঁহার তিরোধানে সর্ব্বাণী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, সংসারে আপন-পর বলিয়া যে একটী কথা আছে তাহা কত অর্থহীন। এ বিশ্ব-

সংসারে আপন বা পর বলিয়া কেহ নাই। যাত্রীর মত সকলে আসে ও যায়; দুদিনের পরিচয়, আবার কে কোথায় ভাসিয়া যায়, কোন ঠিকানা নাই।

সংসারের যাবতীয় ভার পতিব্রতা স্ত্রী এবার নিজের স্কন্ধে লইয়াছেন। শাশুড়ী জীবিতা থাকিতে তিনি আশে-পাশে ছায়ার মত ঘুরিয়া শুধু সব কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, দায়িত্ব কিছু ছিল না। শত অভাব-অভিযোগের ভিতরেও তিনি জানিতেন, বিরাট আশ্রয়ের নীচে তাঁহার আসন, কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। কিন্তু আজ? আজ যখন যাবতীয় সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়িল তখন তিনি বুঝিলেন, এই গুরু ভার বহন করা কত কঠিন। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল নয়। দুঃখদারিদ্র্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। মাতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের একেবারে হুঁশ নাই। বাড়ীতে আসা প্রায় বন্ধ—সংসারের খোঁজ-খবর লওয়া তো দূরের কথা। সর্ব্বাণী তাঁহার সন্তানাদি লইয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কাটাইতেন। কিন্তু কখনও রামপ্রসাদকে বিরক্ত করিতেন না, বা অভাব-অভিযোগ জানাইতেন না। সাধনার স্থানেও তিনি কোন দিন কৌতূহল-নিবারণার্থও যাইতেন না। একদিন হঠাৎ রামপ্রসাদ বাড়ী আসিয়াছেন। সন্তানাদির

মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, তাহাদের খাওয়া হয় নাই। হঠাৎ রামপ্রসাদের চমক ভাঙ্গিল। দিনের পর দিন কি তাহা হইলে এইভাবেই চলিয়াছে? সন্তানাদির ভরণ-পোষণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য—তিনি বুঝেন, কিন্তু কি করিবেন? ইচ্ছা করিয়া তিনি তো আর কর্ত্তব্যে ত্রুটি করেন না। কি ভাবে কোথায় তাঁহার মন চলিয়া যায়, তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। সর্ব্বাণীর সুকঠিন ধৈর্য্য দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। অভাব-অভিযোগের কথা তো জানাইতে পারিত! বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাঁহার এই কঠোর আত্মসংযম দেখিয়া রামপ্রসাদ স্তম্ভিত। সংসারে যদি দেবীর আসন কাহাকেও দিতে হয় তবে সে সর্ব্বাণীকে। রামপ্রসাদ মাকে জানাইলেন এবং আশ্চর্য্য রকমে সেদিন আহারাদির সংস্থান হইয়া গেল। রামপ্রসাদ দুই-এক দিন বাড়ীতেই রহিলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা ভাবিয়া সংসারের কাজে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি যে কিছু নাই তাহা নহে; কিন্তু দেখাশুনার অভাবে সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। 'তারানামে সকলই ঘুচায়' এই বলিয়া রামপ্রসাদ আবার নির্লিপ্ত।

এই ভাবে নানা অসুবিধা-অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া সুখে-দুঃখে দেবী সর্ব্বাণীর দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। বাকী জীবন তিনি সংসারের যাবতীয় দুঃখভার মাথায় লইয়া নীরবে নিঃশব্দে ঘরকন্না করিয়াছেন। একটী দিনের জন্যও স্বামীর সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই। প্রসাদও সাংসারিক কার্য্যে আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের স্বর্গারোহণ

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। শেষ বয়স তিনি দান-ধ্যান ও ভগবদ্-ভজনেই কাটাইতেন। তিনি প্রজারঞ্জক, তাঁহার সময় তাঁহার রাজ্যে কখনও প্রজাদের উপর উৎপীড়ন-অত্যাচার হইত না। কঠোর কর্ম্মী, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিতেন। কিন্তু শেষ বয়সে দেখা গেল, তাঁহার মন যেন ধীরে ধীরে এ পার্থিব রাজ্য ছাড়িয়া কোন্ এক অজানা দেশের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রাজকার্য্যে তেমন আর মনোযোগ নাই। প্রায় সব সময়েই গম্ভীর হইয়া থাকেন। কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলিতে দেখা যায় না। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কি যেন একটা অভাব

অনুভূত হইতেছে! তাঁহার এ ভাব দেখিয়া সময় সময় তিনি নিজেই অশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। কি হইল! এই অবস্থায় তাঁহার একমাত্র ভালবাসার বস্তু, প্রাণের মানুষ রামপ্রসাদকে মনে পড়িল। সংবাদ পাঠাইলেন। রামপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া মহারাজের পাশে দাঁড়াইলেন। মহারাজের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—দেরী আর নাই, জীবন-সন্ধ্যায় শেষের বাকী কয়টা দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদকে পাইয়া মহারাজের আনন্দের সীমা রহিল না। কত আদর করিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে স্থান দিলেন। আজ হৃদয়ের গভীরতম উৎস হইতে কত কাহিনী, কত কথা, কত জিজ্ঞাসা একের পর এক করিয়া উঠিতে লাগিল। সাধক রামপ্রসাদ মায়ের নামে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আনন্দে গান গাহিয়া মহারাজকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অন্তিম শয্যায় রামপ্রসাদকে পাইয়া মহারাজের জীবন সার্থক। প্রসাদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে অহর্নিশি মায়ের গান শুনিয়া তিনিও দিব্যভাবযুক্ত।

"এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা॥"

সাধক রামপ্রসাদ এবং মহারাজের জীবন-নাট্য এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল

কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কালের গতি অবাধ। মহারাজের আয়ুশেষ হইয়া আসিল। ৭৩ বৎসর বয়সে মায়ের নাম করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল। মহারাজের তিরোধানে নবদ্বীপের প্রতিপত্তিও ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তখন মুসলমান রাজত্বের প্রায় শেষ। বাংলার নানা স্থানে ভীষণ অরাজকতা ও গোলযোগ উপস্থিত। এত বড় নদীয়ার এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। নদীয়ার ভাগ্যরবি পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর রামপ্রসাদের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। প্রথম দুই-চারি দিন একটু গম্ভীর হইয়াছিলেন। তারপরেই সদানন্দ-ভাব পরিলক্ষিত হইল। বিষাদের কালিমা তাঁহার মনে কোন ছাপ দিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সদানন্দ পুরুষ হাসিয়া খেলিয়া বেড়ান ; একেবারে আপন-ভোলা, সকলের সঙ্গে বেশ আনন্দ করিতে লাগিলেন। কত ভক্ত আসে যায়! সকলের সঙ্গে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। কাহাকেও বা ভক্তিভাবে আলিঙ্গন, কাহাকেও বা মায়ের সুমধুর নাম-গানে আপ্যায়ন, আবার কাহারও সঙ্গে বা তীব্র বৈরাগ্যের কথা আলাপন, রামপ্রসাদ

কি এক অজানা দেশের খবর পাইয়াছেন যাহার জন্য এই অবস্থা। সর্ব্বভূতে সমান ভাব। মনে হয় সাধক এইবার সর্ব্বোন্নত তুরীয় ভাবে উপনীত হইয়াছেন। তাহা না হইলে এ ভাব হয় না।

স্ত্রী ও পুত্রেরা তাঁহার বর্ত্তমান ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বাড়ীর বাহিরে বড় একটা যাইতে দিতেন না। তিনি বেশীর ভাগ সময় সিদ্ধাসনে বসিয়াই বিভোর হইয়া থাকিতেন। কখনও বাহ্যিক চেতনা থাকিত, কখনও বা থাকিত না। কখনও ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ, আবার কখনও ভাল বেশভূষা অঙ্গসজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। এক অদ্ভুত ভাব! নিজে না দেখিলে বা অনুভব করিতে না পারিলে ইহা বুঝা শক্ত। তখন মাঝে মাঝে গাহিতেন—

"গেল না গেল না বিষয়-বাসনা।
হ'ল না হ'ল না তারা-আরাধনা॥
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে সেবাসন।
রটে না রসনা ভ্রমে একদিন॥"

ক্রমে আহার-নিদ্রা ভুল হইতে লাগিল। এক নূতন ভাবের ভাবুক রামপ্রসাদের আজ চরম অবস্থা। তাঁহার মন আর বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে চায় না। আজ আর তাঁহার বাহ্যিক পূজা-আহ্নিক প্রভৃতির কিছুই

প্রয়োজন নাই। এই অবস্থা-উপলব্ধির জন্য যুগ যুগ ধরিয়া কত ঋষি মুনি কত তপস্যা করিয়াছেন। কত ভজন, কত ধ্যান-ধারণা! রামপ্রসাদ তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানিকে মায়ের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, নিজস্ব বলিতে কিছুই নাই। তাই এত সহজে এই চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন—মহামায়ার প্রভাবে বাধাবিঘ্ন সবই দূরীভূত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ধন্য, ধন্য তাঁহার গর্ভধারিণী জননী আর ধন্য তাঁহার জন্মভূমি কুমারহাটী গ্রাম।

"তারা আমার নিরাকারা"

সাধক রামপ্রসাদ আজীবনই মায়ের মধুর নামগান রচনা করিতেন এবং সময় সময় সেগুলি গাহিয়া বিভোর হইতেন। শেষ বয়সে নিরাকার-সম্বন্ধীয় কয়েকটী ভজন গান তিনি রচনা করেন। শেষের গানগুলি দেখিয়া প্রসাদ-প্রসঙ্গকার ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ এবং আরও অনেক সাহিত্যিক তাঁহাকে নিরাকারবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক স্থলে এই লইয়া বৃথা বাদানুবাদও হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মতে, প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ 'জড়-উপাসক' এবং 'পৌত্তলিক' ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাঁহার মত

পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি নিরাকার-ভজনে মন দেন। এই বিষয়ে একটু আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সাকার-নিরাকার লইয়া বাদানুবাদ করা বৃথা। নিম্নে আমরা এ বিষয় লইয়া একটু আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল দর্শন মনঃসংযম করিবার জন্য নানা উপায় নানাভাবে বলিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি প্রথমেই বলিয়াছেন, মনঃসংযম অতি কঠিন ব্যাপার। চক্ষু মুদিয়া আসনে ধ্যান করিতে বসিলেই ধ্যান হয় না। বাহিরের যে কোন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া প্রথম অবস্থায় চেস্টা করিতে হয়। বিচিত্র সংসারে মানুষের রুচিও বিচিত্র। সেইজন্য পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে—"যথাভিমতধ্যানাদ্বা" অর্থাৎ যার যেমন রুচি, সেই অনুযায়ী মূর্ত্তি রাখিয়া ধ্যান করিবে। প্রাচীন ঋষিগণ অতি বিচক্ষণ মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহারা মানুষের মনকে বুঝিতেন, সেইজন্য সাধন-বিষয়ে মানুষকে এতটা স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রতীক, প্রতিমা-উপাসনা এবং নানা দেব-দেবী-উপাসনার সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি নানা দেব-দেবী ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা ভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মে প্রতিমাপূজা ও উপাসনাদির সৃষ্টি ঠিক এইভাবে ধীরে ধীরে হইয়াছে। মানব-সমাজে সকলকে ভগবানের উপাসনা একই ভাবে

করিতে হইবে, এই নিয়মটুকু করিয়া দিলে বোধ হয় ধর্ম্মরাজ্যে এবং উপাসনায় এতটা আগ্রহ থাকিত না। যেমন আমরা সাংসারিক জীবনে দেখিতে পাই, একই পরিবারের তিনটী ভাই—কেহ পূর্ত্তকার, কেহ বা অধ্যাপক, আবার কেহ বা চিকিৎসক হয়। যেহেতু এক পরিবারের লোক বলিয়া সকলকেই অধ্যাপক হইতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম করা যায় কি? প্রত্যেকে রুচি-অনুযায়ী নিজের রাস্তা বাছিয়া লয়। বিশেষ করিয়া স্বাধীন দেশ-গুলিতে শিক্ষার ধারাই এই। ছাত্রগণ রুচি-অনুযায়ী ভবিষ্যৎ ঠিক করিয়া লয়। ধর্ম্মরাজ্যেও ঠিক তাই। নতুবা দুদিনেই উপাসনা প্রভৃতি প্রাণহীন হইয়া যায়, ইহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। মনস্তত্ত্ববিদ্ প্রাচীন ঋষিরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন বলিয়াই নানা দেবদেবীর উপাসনা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য এবং পথ—এই দুইটীতে গোলমাল করিয়া আমরা যত বাদানুবাদের সৃষ্টি করি। ধীরে ধীরে মন স্থির করিয়া একাগ্র চিত্তে ভগবানের উপাসনা করা এবং তাঁহাকে লাভ করা এবং ধীরে ধীরে নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত পৌঁছানো—ইহাই মানব-জীবনের চরম আদর্শ। প্রতীক-প্রতিমা-উপাসনাদি সাধক-জীবনে পথ মাত্র—অবলম্বন। উদ্দেশ্য এবং পথ—এই দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বুঝিলে, ইহা লইয়া আর বৃথা বাদানুবাদ আসে না।

"তারা আমার নিরাকারা"

পাতঞ্জল যোগসূত্রে আরও আছে—প্রতিমা-উপাসনাদি অবলম্বন করিয়া মানুষের মন যখন স্তরে স্তরে উঠিতে থাকে,তখন সাধক আসনে বসিয়া হৃদয়মন্দিরে ইষ্টের উপাসনা করিতে পারে, বাহিরের অবলম্বনের আর প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে সাধকের মন মখন সপ্তম ভূমিতে উঠে, তখন বাহিরের মন্দির বা হৃদয়-মন্দির, কোন মন্দিরেরই প্রয়োজন হয় না। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মন একবার গেলে, এ জগতে বৈচিত্র্যের কোন চিহ্নই থাকে না কোথায় বা প্রতিমা, আর কোথায়ই বা প্রতীক! ছোট ছেলে প্রথম বিদ্যালয়ে গিয়ে যখন ক, খ, সামান্য কয়েকটী অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করে তখন তাহার শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি কত সাজ-সরঞ্জামের দরকার হয়.কিন্তু এই ছেলেই বড় হইয়া যখন ধীরে ধীরে এম-এ পাশ করে, তখন খস্ খস্ করিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া যায়। কোথায়ই বা থাকে শ্লেট আর কোথায়ই বা থাকে পেন্সিল।

সাধক যখন এইভাবে সাধনার শেষ স্তরে উঠেন, তখন সাকার ও নিরাকার দুই-ই তাঁহার কাছে সমান। রামপ্রসাদও সাধনার চরম স্তরে উঠিয়া সাকার নিরাকার যে ভাবেই বিভোর হইয়া যাইতেন এবং যখন যে ভাবে থাকিতেন তখন সেই জাতীয় গান রচনা করিতেন। কখনও তিনি শ্যামা মাকে স্থূলা, সূক্ষ্মা, সগুণা,

নিগু´ণা-রূপিণী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে আহ্বান করিতেন। আবার কখনও বা "নিরুপম-বেশ বিগলিত-কেশ বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ বরণে"—বলিয়াও গান রচনা করিতেন। আবার একেবারে নিরাকার ভাবের গানও অনেক দেখা যায়। যথা—

"ওরে শত শত সত্য বেদ—তারা আমার নিরাকারা ॥
ধাতু-পাষাণ-মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি—বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥"

অথবা—

"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি মন তাও জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটীর মূর্ত্তি
গড়িয়ে করলি উপাসনা ॥"

আবার নিম্নলিখিত গানেও ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—

"এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি ;
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথে রেখেছি।
সবার—শ্যামানাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥

সুতরাং উপরের উক্তি হইতে এবং রামপ্রসাদের আরও নানাবিধ গান হইতে ইহা পরিষ্কার যে, তিনি সাকার নিরাকার দুই-ই মানিতেন। তিনি শুধু সাকারবাদী অথবা শুধু নিরাকারবাদী—এই বলিয়া তর্ক করা বৃথা। সংসারের সাধারণ মানুষকে শিখাইবার জন্য জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি মূর্ত্তি-উপাসনা করিয়াছিলেন। মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া! তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। তিনি আরও কত কি! সাধারণ মানুষ তাহার কি অর্থ করিবে? সাধনার স্তরে মন ধীরে ধীরে উঠিলে স্বতঃই এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়; বিচার করিবার আর অবসর থাকে না। সুতরাং 'তারা আমার নিরাকারা' এবং 'এলোকেশী দিগ্বসনা'—এই দুই সত্য।

বিদায়

প্রতি বৎসর ঘটা করিয়া রামপ্রসাদ দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজা করিতেন। নিজের হাতে প্রতিমা

গড়িতেন। নানাবিধ আভরণাদি মাকে কত আদর করিয়া পরাইতেন। পূজার দিনে সমস্ত রাত তিনি মায়ের পূজায় মগ্ন। ঘোর অমানিশায় বিবিধ গান রচনা করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এই বিরাট কালীপূজা দেখিবার জন্য প্রতি বৎসরই অপেক্ষা করিয়া থাকিত। সমাধিমগ্ন সাধকের সব জিনিস তাহারা বুঝিত না; কিন্তু সুমধুর কণ্ঠের গানগুলি বড় মধুর লাগিত এবং তাহারই জন্য ছুটিয়া আসিত। ভক্তগণ সমস্ত রাত পাশে বসিয়া মনোরম দৃশ্য প্রাণ-ভরিয়া দেখিত।

এবারও দুর্গাপূজা শেষ হইয়াছে। দীপান্বিতা অমাবস্যা সামনেই। রামপ্রসাদ মায়ের পূজার জন্য ধীরে ধীরে যাবতীয় বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু এ বৎসর যতই অমাবস্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই প্রসাদের হাব-ভাব চাল-চলন উঠা-বসা এই সবের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। কেমন যেন একটা আনমনা ভাব। প্রায় গম্ভীর হইয়া থাকেন। কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না, দেখিলে মনে হয় যেন একটা তীব্র বৈরাগ্যের দাহে তাঁহার শরীর মন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, কেমন যেন একটা যাই-যাই ভাব তাঁহাকে পীড়া

দিতেছে। স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে এ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে, যদি পারে যাবি মন আয় ছুটে।
তারা-নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরা তরী চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গেরো দাওরে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, কি করবে আর বসে হাটে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মন বাঁধরে এঁটে-সেঁটে,
ওরে এবার আমি ছুটেছি, ভবের মায়াবেড়ি কেটে।

আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী ভক্তেরা তাঁহাকে একজন খ্যাতনামা মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করিতেছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বসাধারণের একজন মাত্র—এর বেশী দাবী কোন দিনই কাহারও কাছে করেন নাই। তাঁহার সরল স্বভাব, অনাড়ম্বর ভাব—ইহাই আজীবন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছিল। সুতরাং প্রতি বৎসর যখন দীপান্বিতা অমাবস্যার বহু পূর্ব্ব হইতেই দলে দলে লোক আসিত এবং পূজার আয়োজনাদি দেখিয়া আনন্দ করিত, তিনিও তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আদর-সম্ভাষণাদি করিতেন, প্রাণ ভরিয়া মায়ের নাম শুনাইতেন। কিন্তু এ বৎসর তিনি

যেন নূতন মানুষ। কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। কি একটা অচেনা অজানা দেশের প্রতি তাঁহার মন নিবিষ্ট রহিল কে বলিতে পারে? মাতৃবিয়োগের ব্যথা সামলাইতে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেহত্যাগ তাঁহাকে অধীর করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। অকারণে গম্ভীর হইয়া পড়েন, আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেন। সকলের নিকট অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু কেন এমন ঘটিতেছে ভাবিয়া পাওয়া দায়। জীবন-সমুদ্রের ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে, নানা আপদ্-বিপদে তাঁহাকে কখনও এতটা বিচলিত হইতে দেখা যাইত না। কিন্তু এখন তো সংসারে বাধা-বিঘ্ন তেমন কিছু নাই, কোন অভাবনীয় ঘটনাও তেমন পরিলক্ষিত হয় না। অথচ এই অদ্ভুত ভাব কেন—কেহ অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, সাধকের নিভৃত চিত্ততলে যে একটা দাবাগ্নি জ্বলিতেছে ইহা বেশ বুঝা গেল। যাহারা অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গে মিশিত এবং মানবচিত্ত সম্বন্ধে যাহাদের এতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল, তাহারা বুঝিল—দিন আর নাই। রামপ্রসাদ বিদায়ের পালা গাহিতেছেন। বাকী কয়টা দিন তিনি এইভাবেই চলিবেন। পূর্ব্বের অবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না।

সাধকের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি ভাব খেলিয়া বেড়াইতেছে—কে বলিবে? অন্তর্য্যামী ব্যতীত দ্বিতীয় সাক্ষী ইহার আর কেহ রহিল না।

দীপান্বিতা অমাবস্যা উপস্থিত। পূজার যাবতীয় আয়োজন প্রস্তুত। সাধক আসনে বসিয়া মায়ের পূজায় মগ্ন। কি করুণ মিনতি, কি কাতর প্রার্থনা, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মায়ের নামগানে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য! নূতন নূতন গান মাকে শুনাইতে লাগিলেন। সে সুমধুর সুর অমানিশার আকাশে বাতাসে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বাইতে নারি ডুবে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই করছে দাগাদারী॥
এনেছি, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালী।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে ভারী॥
দীন রামপ্রসাদ বলে—মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর;
আপন ঘরে যায় যে চুরী॥

পূজা-মণ্ডপে অপূর্ব্ব ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত। পরদিন তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। অপরাপর বৎসরের ন্যায় প্রতিমা-বিসর্জ্জনের যাবতীয় আয়োজন করিলেন। মঙ্গলঘট মাথায় করিয়া সুমধুর মায়েব গান করিতে করিতে ভাগীরথীর দিকে চলিয়াছেন। সঙ্গে অপর সকলে প্রতিমাদি লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ রামপ্রসাদ আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন এবং একটীর পর একটী করিয়া চারিটী মনোরম গান গাহিলেন।

১। তিলেক দাঁড়াও রে ওরে শমন।

২। বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।

৩। মরলাম ভূতের বেগার খেটে।

৪। তারা, তোমার আর কি মনে আছে।*

মনের আনন্দে ভক্তিভরে এই গান কয়টী গাহিতে লাগিলেন। চতুর্থ গানের শেষ চরণ দুটী—

"প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়
ওগো ওমা, আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে।"

গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। অপূর্ব্ব জ্যোতিতে কোমল অঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! "দক্ষিণা

---

* এই গান চারিটি 'প্রসাদের রচনাবলী'র শেষের দিকে আছে।

হয়েছে”—এই বাক্যটী যখনই মুখ হইতে বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু আকাশে মিশিয়া গেল। পাঞ্চভৌতিক দেহটী মাত্র পড়িয়া রহিল।*

পতিতপাবনী কুলকুলনাদিনী মা ভাগীরথী সাধক রামপ্রসাদকে নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন। রাম-প্রসাদের জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন হইল।

বিদায়! বিদায়! সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া জন্মের মত বিদায় লইলেন। বড় সাধের জন্মভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

বঙ্গদেশ রামপ্রসাদের মত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গালী জাতি বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলার আকাশে বাতাসে গানের লহরী খেলিয়া বেড়াইবে, ততদিন রামপ্রসাদের স্মৃতি মুছিয়া যাইবার নহে—ততদিন প্রতি বাঙ্গালীর নিভৃত চিত্ততলের করুণ পর্দ্দায় প্রসাদী সঙ্গীত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইবে।

* রামপ্রসাদ যে কত বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন সঠিক জানা যায় না। কেহ বলেন ৮০ বৎসর, কেহ বলেন ১০০ বৎসর।

আর একটী কিংবদন্তী আছে যে, পতিব্রতা স্ত্রী সর্ব্বাণীও স্বামীর সঙ্গে দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই ঘটনার বহু পূর্ব্বেই সর্ব্বাণী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রসাদের রচনাবলী

প্রসাদের রচনাবলী

সাধক রামপ্রসাদের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কবি রামপ্রসাদ অথবা সাহিত্যিক রামপ্রসাদের পরিচয় আমরা পাই নাই। বাংলার ঘরে ঘরে আজও রামপ্রসাদের সঙ্গীত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। ছেলে-মেয়ে, বালক-বৃদ্ধ, সকলেই প্রসাদ-সঙ্গীত গান করিয়া আনন্দ অনুভব করে। এই সুর সাধারণতঃ 'রামপ্রসাদী সুর' নামে চলিয়া আসিয়াছে। রামপ্রসাদ এই সুরের প্রবর্ত্তন করেন, অথবা পূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রচলিত ছিল, তাহা বলা শক্ত ; তবে তাঁহার সময়ে জনসমাজে ইহার বহুল প্রচার হয়। গানের ভাষা সহজ, সরল, কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য্য এত বেশী যে সাধারণ মানুষ ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সমস্যাসমূহ অতি সাধারণ গানের ভিতর দিয়া তিনি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত।

'মন রে, কৃষি-কাজ জান না—এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ ক'রলে ফলত সোনা'—অতি সহজ ছন্দ, সরল ভাষা। কিন্তু ইহার মধ্যে কি পরিমাণ

ভাবের সমাবেশ হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রামপ্রসাদ সাধক মহাপুরুষ। ভাবের আবেগে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সুরের লহরী উঠিত, তাহাই তিনি আনন্দের সহিত গাহিতেন এবং সেইজন্যই উহা সকলের নিকট এত আদরণীয় হইয়া উঠে। তখন মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলন ছিল না—মুখে মুখেই গান-গুলি চলিয়া আসিয়াছে।

রামপ্রসাদ যে কত গান রচনা করিয়াছিলেন, কিছুই বলা যায় না। তাহার একটী গানে আছে—'লাখ উকিল করেছি খাড়া'। একজন মানুষের জীবনে লক্ষ গান লেখা সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত আড়াই শত রামপ্রসাদী গানও সংগৃহীত হয় নাই। ইহা বাংলা তথা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে যে কত বড় ক্ষতিকর, বলিয়া বোঝান যায় না। ভবিষ্যতে এ অভাব পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। গান ব্যতীত প্রসাদের আরও অন্য অনেক রচনা আছে। শিব-সঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কালী-কীর্ত্তন সবই গীতিময়। শিব-সঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকাংশই পাওয়া যায় না। কালী-কীর্ত্তনে মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ-রচয়িতা ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রসাদের

বংশধরের নিকট হইতে অনেক কাগজ-পত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, রামপ্রসাদের স্বহস্ত-লিখিত কোন গান তাহাতে পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য লোক-মুখে শ্রুত গান প্রকাশ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের ভগবদ্ভক্তি এবং কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। প্রতিদানে তিনি 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' নামে একখানি মনোরম কাব্যগ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দেন। এই বিদ্যাসুন্দর কোন বাংলা কবির মৌলিক রচনা নহে। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বররুচি ইহার স্রষ্টা। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অতি প্রাচীন। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর', রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' এবং প্রাণারাম চক্রবর্ত্তীর 'কালিকামঙ্গল' —এই চারিখানি বিদ্যাসুন্দর বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' রচনা অতীব মনোরম। ভাব ও ভাষা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থখানি রচনা করেন।

কথিত আছে, ভারতচন্দ্র প্রথম অন্নদামঙ্গল লিখিয়া মহারাজকে উপহার দেন। মহারাজ অন্নদামঙ্গল পড়িয়া অতীব আনন্দিত হন। বাস্তবিক, কবি ভারতচন্দ্রের অদ্ভুত ক্ষমতায় এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সহজ সরল ভাষা যেন গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অবিরাম চলিয়াছে। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, কঠিন শব্দের ব্যবহার নাই। এক সময়ে মহারাজ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতচন্দ্র, তুমি যে মহাপণ্ডিত সন্দেহ নাই, কিন্তু আদিরসের তুমি কিছুই জান না।" এই কথার প্রতিবাদে ভারতচন্দ্র আদিরসাত্মক 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মহারাজকে উপহার দিয়া বিদ্রূপাত্মক কথার জবাব দেন। বাস্তবিক বলিতে গেলে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' বঙ্গসাহিত্যে এক উপাদেয় বস্তু। গ্রন্থখানি সবই আদিরসাত্মক, কিন্তু ভাব ও ভাষায় বিশেষ জনপ্রিয় হইযাছে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরের' ভাষা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। অবশ্য কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, রসিকতা, ভাবুকতা সবই তাহাতে আছে, তাহা হইলেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পাশে দাঁড়াইতে পারে না। ভাব ও ভাষা দুই ই জটিল। অনেক পারস্য ও হিন্দী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ; মাঝে মাঝে মৈথিলী ভাষারও সন্নিবেশ আছে। রামপ্রসাদের দুর্ব্বোধ শব্দাদি-বিন্যাসে গ্রন্থখানি যে কঠিন

হইয়া পড়িয়াছে, উহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন। গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার।
সে বুঝে অক্ষর—কালী হৃদে আছে যার॥

এই গ্রন্থখানি তিনি যে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য লিখেন নাই ইহা বেশ বোঝা যায়। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ তাঁহার আরাধ্যা দেবী জগজ্জননী কালীমাতার মহিমা-বর্ণনা হিসাবে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে একটী আধ্যাত্মিকতার ভাব বরাবর ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ স্থানে স্থানে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এত বড় সাধক রামপ্রসাদ—মায়ের নামে তিনি অহর্নিশি পাগল! অথচ তিনি আদি-রসাত্মক এই গ্রন্থখানি কেন লিখিলেন ঠিক বুঝা গেল না। যতটুকু মনে হয়, মহারাজের মহৎ দানের প্রতিদানে এই গ্রন্থখানির সৃষ্টি। তিনি বিদ্যাসুন্দরের দক্ষিণাকালিকামূর্ত্তি-সংস্থাপন ও শবসাধন-উদ্যোগ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হবো ব্যস্ত॥

ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায়, সহজ সরল মাতৃনাম-সম্বন্ধীয় গানই তাঁহার প্রাণের জিনিস এবং এই সুমধুর গানই বাংলার ছেলে-মেয়ে শিশু-বৃদ্ধের হৃদয়ে ধ্বনিত

প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রাণের জিনিস বলিয়াই সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি ভিতরের তাগিদে প্রাণস্পর্শী গানসমূহ এবং বাহিরের তাগিদে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা বিশেষ করিয়া মানুষের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই এবং কবিত্বও তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। নিম্নে 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে কয়েকটি স্তব এবং মায়ের মহিমা-বর্ণন-বিষয়ক মনোরম ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

কবিরঞ্জন

বিদ্যাসুন্দর

অথ গণেশ-বন্দনা

পরম পুরুষ পহু, পুনঃ পুনঃ প্রণমহু,
পর্ব্বতেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর, বিনায়ক বিঘ্নহর,
বারণবদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু, অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু,
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।

আভরণ নানা মত, মণি হেম মরকত,
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ড-গণ্ড ॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ, আরোহণ আখু-পৃষ্ঠ,
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম, যম জিনি যোগাধাম,
যায় তায় করি অধিকার ॥
দেব দেব দীনবন্ধু, দাসে দেহি দয়াসিন্ধু,
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব-কর্ম্মে তুমি মূল, হও শীঘ্র অনুকূল,
আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার ॥
রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ-পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া ॥

অথ সরস্বতী-বন্দনা

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি, বন্দো মাতা সরস্বতী,
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী, ভুবনমোহন ভঙ্গী,
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী ॥

শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ, হংসবধূ অনুক্ষণ,
হৃদিমধ্যে বিহর মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা,
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥

নানা যন্ত্র তাল মান, আলাপে মোহিত জ্ঞান,
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
ধন বিদ্যা সঙ্গীত পর, যে গানে ত্রিপুরহর,
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥

সেই বস্তু এই গঙ্গা, নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা,
কণা-মাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি, দর্শনে কৈবল্য মুক্তি,
স্নানফল কহিবে কি নরে॥

ব্যাস-বাল্মীকাদি-চয়, মহাকবি মহাশয়,
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান।
বহুকষ্টে চিত্তে খেদ, সঙ্কলন করি বেদ,
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান॥

তব কৃপাদৃষ্টি যারে, জগত জিনিতে পারে,
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম, জীয়া তার কিবা কাম,
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য॥

তুমি বিশ্ব অন্তর্য্যামী, স্তব কিবা জানি আমি,
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা, স্মরহর হরি ধাতা,
কোনরূপে না পাইলা সীমা॥

অথ লক্ষ্মী-বন্দনা

কমলে কমলা বন্দো কোমল শরীর।
কমল-চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর॥
গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ॥
কান্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্ম কোক।
তব রোমাবলী কুচ কুম্ভ কহে লোক॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসর।
পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা॥

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ॥
নিন্দিযা গৃধিনীশ্রুতি শ্রবণযুগল।
দরিদ্র-দ্রবিণ-আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান হয়।
তৃণতুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
স্বত্বদানে বিজ্ঞগুণে সে লভে সাযুজ্য॥
যে গৃহী জনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্মলোপ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥
এ সকল তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী॥

অথ কালী-বন্দনা

(১)

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালীনাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্য ধাম
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই॥
রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তি-গজপৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥
নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ-উরে
বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো
কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করালী লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয়দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥

বিবস্ত্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপচ্ছটা।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধে ঊর্দ্ধমুখে গিলে রিপুঘটা॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুল-সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয়-সৃষ্টি মজিল সকল॥
অখিল জননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে
আমি কি অধম এতো বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

---

(২)

অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য-কথা শুন গুণসদ্ম॥

বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস।
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ ॥
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রাপ্ত মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি ॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধভয়।
চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র-নিরীক্ষণে ॥
সতী সঙ্গী সভক্তি হৃদয় পদ্মবৃন্দ।
নিতান্ত বিস্মিত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ ॥
মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়তি কোনরূপে পাই পরিত্রাণ ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদগদ ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

প্রসাদ-পদাবলী*

১

প্রসাদী—একতালা

মনরে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানবজমি রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।
কালীনামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এইবেলা, তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥

২

প্রসাদী—একতালা

মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোকঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত॥

* প্রসাদ-পদাবলী আড়াই শতের কিছু বেশী সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হইল।

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি পশুপক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলেম হত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোকের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা. কুমাতা নয় কখনত।
(প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার করে রেখ পদানত॥)
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

৬

জংলা—একতালা

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে. আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।
ওরে অনলদাহন যথা করে তূলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥

কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল. জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

৪

প্রসাদী—একতালা

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দূরে যাবে মনের ব্যথা ॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা।
ওমা যেজন তোমার নাম করে মা, তার কপালে ঝুলি কাঁথা ॥

৫

প্রসাদী—একতালা

ভাবনা কালী ভাব্না কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা ॥

অরুণ-উদয়কাল, ঘুচিল তিমির-জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়্-দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা ॥
যেখানে আনন্দহাট, গুরুশিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা ॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্‌লো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥

৬

প্রসাদী—একতালা

এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বলবো এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি, সে চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
পিতা-পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখমাত্রে বলবো তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কেমন করে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় পদের জোরে ॥

৭

প্রসাদী—একতালা

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালেরো কাল যে মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকেরে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালেরে ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
অমন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
ও মন দুর্গানামে ভয় থাকে না, ঘুচে যায় ভাবনা যত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মনের ভুলে ভেবে ভেবে হলে হত।
এখন গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর কি করবে রবিসুত॥

৮

মূলতানী—একতালা

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারানামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে;
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥

দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায় ;
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে ;
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥

৯

প্রসাদী—একতালা

অভয় চরণ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে।
তোমার পিতামাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হ'লে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
সদা ভাং খেয়ে সে মত্ত ভোলা, তুষ্ট কেবল বিল্বদলে ॥
মা হোয়ে মা জন্মে জন্মে, কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে ॥

১০

প্রসাদী—একতালা

এবার বাজি ভোর হলো।
ও মন কি খেলা খেলাবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো ॥

দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো ॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল
ওরে অতঃপরে কোণার ঘবে পালের কিস্তি মাত হ'ল ॥

১১

পেসাদী—একতালা

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
হয়ে ধর্ম্ম-তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তবু শিবের দৈন্যদশা ॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিসে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোসা ॥
ওরে সুখেই দুঃখ দুঃখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা ॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতিমাষা ॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥

১২

প্রসাদী—একতালা

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে।
আমি কাজ হারালাম কালের বশে ॥
যখন তারা ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা স্থত, সবাই ছিল আপন বশে ॥
এখন আমার ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা স্থত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
যমদূত এসে শিয়রেতে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি. যে যার যাবে আপন বাসে
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥

১৩

প্রসাদী—একতালা

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছ'টারে গরল খাইয়ে প্রাণে মারি
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, তারে দিলি জমিদারী ॥

হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিস্‌ তার আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়ালবন্দী, যেরূপেতে আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি॥

১৪

প্রসাদী—একতালা

মা আমার অন্তরে আছ।
(তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা)॥
তুমি পাষাণমেয়ে বিষম মায়া, কতই মা কাচাও গো কাচ॥
উপাসনা-ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ।
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেযে কাচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥

১৫

প্রসাদী—একতালা

নিত্যই তোয় বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নাক মনরে ঠেটা॥
কোথা রবে ঘরবাড়ী তোর, কোথা রবে দালান-কোঠা।
যখন আসবে শমন, বাঁধবে কসে মন, কোথা রবে বাপ খুড়া জেঠা
মরণসময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চ্যাটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে যে রে জাব্‌দা আটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে, ছাড়রে সংসারের লেঠা॥

১৬

প্রসাদী—একতালা

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥

১৭

প্রসাদী—একতালা

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিনযাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম-সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে ॥
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাষে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালি,
হ'লেম কালি তার বিষয়বশে ॥

১৮

প্রসাদী—একতালা

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তিদড়া ॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া-রূপেতে, বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া ॥

মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবরছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে মা তোমায় তারা।
তখন একবার এসে কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বেঁধো বেড়া

১৯

প্রসাদী – একতালা

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই হ'লনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ।
মনরে, ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কানে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে, ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা।
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন ;
মনরে, ওরে শ্রীনাথ দত্ত ধর তত্ত্ব কলের কপাট খোলনা॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী,
মনরে, ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে, ওরে সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা

প্রসাদী একতালা

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই ॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥

২১

জংলা— একতালা

রসনে, কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থমাত্র ঘট পটরে ॥

রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃতরস,
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্র বটরে ॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে ॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি-অক্ষর কর মনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে

২২

প্রসাদী—একতালা

কালীপদ মরকত আলানে, মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে, কর্ম্মপাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে।
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদি ভূমি গেল ফেটে।
নব-কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেঁটে ॥
নানা তীর্থ-পর্য্যটনে, শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝনা রে দুঃখ চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম ক'রে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥

২৩

পেসাদী—একতালা

কে জানে রে কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন
প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধরবে শশী হয়ে বামন।

২৪

জংলা একতালা

মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে, ওরে মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে, ওরে কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ

দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে।
মনরে, ওরে তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক্ ॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে দেখ রে আপনার মুখ ॥

২৫

প্রসাদী—একতালা

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে ॥
হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা-বিল্ব-গঙ্গাজলে ॥
এ ভবসংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধ'রে তুলিবে কূলে ॥

২৬

প্রসাদী—একতালা

মন রে, আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা ॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ওরে জমাখরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা ॥

বাদে হলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা।
প্রসাদ বলে দেখ্ সে বুঝে, কিসের খরচ কাহার জমা।
একবার অন্তরেতে ভাব দেখি মন, কালী তারা উমা শ্যামা॥

২৭

প্রসাদী—একতালা

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড়্দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাবলোভে পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারেঠোরে॥

২৮

প্রসাদী- একতালা

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা ॥
ওরে ধিক্ রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ॥
নিরাকার সাকার ককার, ককার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালিটা
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, স্রুব কর যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর, দেবোত্তরে দাগা চিঠা ॥

২৯

প্রসাদী —একতালা

মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধূলাধূলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি

ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্‌লি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি ॥

৩০

প্রসাদী—একতালা

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ যে মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দানধর্ম্ম তদুপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে, যান নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানি কাচ কাচ মা, অঙ্গে ভস্মভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হ'লে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥

৩১

জংলা—একতালা

একবার ডাকরে কালী তারা ব'লে, জোর করে' রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে ॥

ভজনের ছিল ভরসা, সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাবে ভেবে মনে॥

৩২

জংলা—একতালা

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহেমাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা. তেমনি তো দেখায়॥
যেজন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
ওমা তুমিতো অন্তরে জাগ সময় বুঝতে হয়॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় টেকা, এ বড় সংশয়॥
প্রসাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকো না আর, প্রসাদের আশায়॥

৩৩

প্রসাদী—একতালা

এবার কালী কুলাইব।
কালি কোসে কালী বুঝে লব॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব॥

কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা, সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালি হ'য়ে, কালী ব'লে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চলে যাব॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি, তবু কালী বুলি না ছাড়িব॥

৩৪

প্রসাদী—একতালা

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকীকিনি, করে ভরা কৈলে ভারি।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে', সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ি॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হ'ল ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী॥

৩৫

প্রসাদী—একতালা

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা॥

শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,ঘুচলনা আর সিদ্ধিঘোটা॥
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছালি আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি,সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এ যে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা

৩৬

প্রসাদী-- একতালা

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলাম যথা তথা॥
দিবা হ'ল অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে স্থান দাও গো জগন্মাতা॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাখবে রাখ এই কথা॥

৩৭

প্রসাদী—একতালা

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের গান গাহিব॥

আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কতশত গয়াগঙ্গা দেখতে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, নিদানকালে কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব ॥

৩৮

প্রসাদী—একতালা

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে' সারে পিতামাতা।
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়না ব্যথা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥

৩৯

প্রসাদী—একতালা

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মা'র দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা

ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালিচাপা সিকত নদী,তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জানন৷ সেই পদের মজা ॥

৪০

প্রসাদী একতালা

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত,যমের দূত বল্‌গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আনার উরস্‌ পাটে. যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন যে দিগম্বরে ॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আর গলদ আছে।
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে যাবরে মায়ের দরবারে ॥

৪১

প্রসাদী —একতালা

কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা।
দেখবো এবার অধম বলে।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥

এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎসপাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকিজুঁখি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥

৪২

প্রসাদী একতালা

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা॥
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্যকারণ তোমার নাই।
ঙয়ায় সয় তয় রয়, সেইরূপ বর্ণপারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষুঠারা॥
পাগল বেটার কথায় মজে', এতকাল মলেম ভজে'।
দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা।
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥

৪৩

প্রসাদী—একতালা

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি॥
শমনদমন শ্রীনাথচরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥

৪৪

প্রসাদী—একতালা

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়াছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে স্বয়ং থাকতে, কুশের পুতুল কে কোথা দাহন করেছে॥
হিসাব বাকি থাকে যদি, দিব নারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে॥

শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥

৪৫

প্রসাদী—একতালা

তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই মোহরে রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে ॥
মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥

৪৬

প্রসাদী—একতালা

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
'ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে' কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি॥

৪৭

প্রসাদী—একতালা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ ক'রেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি
দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥

৪৮

প্রসাদী—একতালা

তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য মাপাও যেমন যার কপালে॥

তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেও তুমি ভাসাও শিলে॥
তোমার জারিজুরি আমার কাছে খাটবে না মা কোন কালে।
ও সব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে॥

৪৯

প্রসাদী—একতালা

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সামলায়ে বলিস বেটা।
কালীনামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥

৫০

সিন্ধু—ঠুংরী

এমন দিন কি হবে তারা!
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥

৫১

প্রসাদী—একতালা

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরিষে ॥
আগে ভাঙ্গবো গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে ॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি রেখে দূরদেশে।
রব রসাভাষে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলের ফলে সুফল লয়ে যাইব নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন কর কি লওরে সুধা দুজনাতে মিশে।
খাবে একই নিঃশ্বাসে যেন সূর্য্যসম শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠশুদ্ধি তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে খিল দিয়াছি কোসে ॥

৫২

প্রসাদী—একতালা

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো ॥

' বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলব না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলব না গো ॥
ধনলাভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুলব না গো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ॥

৫৩

প্রসাদী—একতালা

মাগো আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে গো আনন্দময়ী ॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি নানাবিধ করি কৃষি।
আমার কৃষিসকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি ॥
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল, অকূল পাথারে ভাসি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব ফাঁসি ॥

৫৪

প্রসাদী—একতালা

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্ পুরুষে ॥
মাগীমিন্সে ঝগড়া ক'রে রইতে নার আপন বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা ক'রে ফিরে কেন দেশে দেশে ॥
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, কেবল তোমার বাপের দোষে।
মাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ করে কৈলাসে ॥

৫৫

প্রসাদী-- একতালা

ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমী আমার দেহমাঝে ॥
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্যখুঁটা ধর্ম্মবেড়া, এদেহে চৌদিক ঘিরেছে।
এখন কাল চোরে কি করতে পারে, মহাকাল রক্ষক হয়েছে॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হ'তে বাহির হয়েছে।
কালীনাম-অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপতৃণ সব কেটেছে ॥

প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥

৫৬

পিলু-বাহার—যৎ

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণা-প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ-চক্ষু বলি তারে,
ওরে, সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পুরে অঞ্জলি যদি চন্দন-জবা-বিল্বদলে॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে॥

৫৭

প্রসাদী—একতালা

মনরে ভালবাস তাঁরে।
যেজন নে-যায় ভবসিন্ধু-পারে॥

এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে ॥
ধনজনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী-কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদাশিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥

৫৮

প্রসাদী—একতালা

ছি মন তুই বিষয়লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না কথা ॥
অশুচি শুচিকে ল'য়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয়, তবে শ্যামা মারে পাবা
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটে' অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞানখড়েগ বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা ॥

কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র ভেদসূত্র তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, ছুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥

৫৯

প্রসাদী—একতালা

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে
কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পানবিধি,
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্মা হবে॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরুছায়া,
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে॥

৬০

প্রসাদী—একতালা

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥

পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ-কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই ক'রে হাঁক ॥

৬১

প্রসাদী—একতালা

ছি-ছি মনভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজে বিষয়-বিষে হলি রাজী ॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নীচসঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি ॥
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন করবে কালে পাপোষ বাজি ॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চোরের কোটায় মন টুটায় যে ভজে সে মত্তগাঁজি ॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজী ॥

৬২

প্রসাদী—একতালা

তাই কালো রূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমন্মোহিনী এলোকেশী॥
কালোর গুণ ভালো জানে শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালো রূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে, অভেদ-জ্ঞানে কালো রূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন ক'রোনাক দ্বেষাদ্বেষি॥

৬৩

প্রসাদী—একতালা

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

৬৪

প্রসাদী—একতালা

মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র সে সূতায় কাট্না কেটেছে।
সেই মায়াসূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে॥

৬৫

প্রসাদী—একতালা

আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
রামপ্রসাদ বলে মা গো এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে ভরা তুলে লাভে মূলে ডুবাইলি॥

৬৬

জংলা—একতালা

আমি ওই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় গো চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি আশয় পেয়েছি, জেনেছি তোমার চাতুরী ॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম
তোমারি ॥
যশঃ অপযশঃ স্থরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরে আখঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥

৬৭

জংলা—একতালা

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ক'রে কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে ॥

যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে ॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হ'য়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥

৬৮

ঝিঁঝিট—একতালা

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ॥

৬৯

প্রসাদী—একতালা

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননী শিবে ॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে,

থাকে থাক, যায় যাক. এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভেবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ-রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আমি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে॥

৭০

প্রসাদী—একতালা

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো পুর হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকেতে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥

হুজুরে তজবিজ কর মা হাজির ফরিয়াদী দাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা তোমার পুতে সতীন-সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥

৭১

খাম্বাজ-রূপক

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ,
বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে॥
সদ্য হত দিতি-তনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে নরকরনিকর, কুণপশিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত, বিম্ববিনিন্দিত, কুন্দবিকসিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও চরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে॥

৭২

প্রসাদী—একতালা

এলোকেশী দিগ্বসনা
কালী পূরাও মোর মনোবাসনা॥

১০

যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দে মা ঠিক-ঠিকানা
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
ওমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানে না॥
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)

৭৩

বেহাগ—একতালা

কেরে ওই মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎপুঞ্জ, মণিমরকতকান্তিছটা,
একি চিত্তছলনা, দৈত্যদলনা, ললনা মলিনী বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশীখণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি, হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারসকূপ, বদনখানি।
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, করুণাময়ী রে, করুণাময়ীরে বল জননী॥

৭৪

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা

বামা ও কে এলোকেশে।

সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অস্তি ঘেষে।

কি সুখে হাসিছে,লাজ না বাসিছে,নাচিছে মহেশ-উরসে।

ঘোর সমরে মগনা,হয়েছে নগনা,পিবতি সুধা কি আবেশে।

ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।

কাহার নারী রে,চিনিতে নারি রে,মোহিত করেছে ছিন্নবেশে।

কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,

রূপে আলো করেছে দিগ্‌দশে।

কি করি রণে রে, হয়েছে মনে রে,

প্রসাদ ভণে রে, চল কৈলাসে॥

৭৫

খাম্বাজ—রূপক

এলো চিকুর নিকর নরকর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী।

সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী॥

শবশিশু ইষু, শ্রুতিতলে, বামকরে মুণ্ড অসি।

বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসী॥

সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।

সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুরেশানুকূলা ষোড়শী।

প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া ভবার্ণব ভয় বাসি।
জনুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥

৭৬

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা

ওকে ইন্দীবর-নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ।
বসনহীনা কে সমরে ॥
মদনমথন উরসি রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়-কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জন মনোহরা শমন-সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
শস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা।
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন-নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপুকদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ-নিকরে ॥

৭৭

বিভাস—তেওট

নবনীল-নীরদ-তনুরুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে ॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি হরি গলিত কুন্তলপাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস ॥

বামার বাম করপর, খডগ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, প্রকাশে যে জনে,
প্রভবে একথা আভাষ ॥

৭৮

খাম্বাজ ঢিমে-তেতালা

ঢল ঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ ॥
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
একি চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে, চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্ত যে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসবপানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ ॥

৭৯

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু-মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥

তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয়দল তনুশ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥

৮০

মল্লার—খয়রা

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আস্ত টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবানিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

৮১

বিভাস—ঢিমে-তেতালা

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥

শিশু-শশধর-ধরা, সুহাস মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে ॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা দন্ত মূলা,
এলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে ॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যেজন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥

৮২

মল্লার—খয়রা

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী ॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।

শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনীরূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে. দিবস রজনী ॥

৮৩

বিভাস—ঢিমে-তেতালা

মরি ও রমণী কি রণ করে।

রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ-প্রায়
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,
প্রবল দনুজঘটা, গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন-বিধু, মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশাবাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মা'র,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥

৮৪

মল্লার—খয়রা

এলোকেশে, কে শবে, এলোরে বামা।
নখর-নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধারা॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রস-রঙ্গিণী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে, ধরাতলে হতরিপু সমা॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ, ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা॥
ভবভয়ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম সুনামা।
তব গুণশ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥

৮৫

বেহাগ—তেওট

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মরহরে॥
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী।
নাসে মুকুতা-ফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে করী করে ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী।

নীলকমল দল-জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচ কলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবল চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত-গামিনী রূপসী॥
দিতি-সুতচয় সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, এ কি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয়-কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জয়ীকালে তুচ্ছবাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি॥

৮৬

ললিত—তেওট

শঙ্করপদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচিবিজিত, তরুণ তমাল॥
যোগিনীগণ সকল, ভৈরব সমর করে, করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ গণ ম্নণ মনয়ব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই, দ্রিম্‌কি, দ্রিম্‌কি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীন-হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ, বারয় কাল করাল॥

৮৭

ঝিঁঝিট—আড়া

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন-মোহিনী॥
ললাট-নয়ন বৈশ্বানর বাম বিধু, বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী।
শব-শিব হৃদয় মন্দাকিনী. রাজত ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর-নিকর, সুধা যামিনী॥
কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণা কুরু হরমোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল-শরণ্যে, মম জীবন-ধন, জননী॥

৮৮

বিভাস—ঢিমে-তেতালা

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগতাসবে॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণীসঙ্গমে মহাপুণ্য লবে॥

অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিবে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে॥

৮৯

ঝিঁঝিট—আড়া

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধা-কর-মণ্ডলবদনী রে॥
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে॥
মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী,
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন-পলকে॥
ভীম ভবার্ণব-তারণ-হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু॥
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননী কালিকে॥

৯০

খাম্বাজ—তেওট

চিকণ-কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারী-হৃদে বিহরে।
অরুণ-কমলদল, বিমল-চরণতল, হিমকর-নিকর রাজিত নখরে।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির-কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী-অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শরখর, কত কত শত শত রে॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে।
ও পদ-পঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু, মামক মানস আশ ধরে॥

৯১

ঝিঁঝিট—একতালা

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী, পরম রূপসী,
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু অনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বামকরে মুণ্ড অসি॥

মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ-ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মা'র,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥

৯২

ললিত—তেওট

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব-ধারা-ধর, রুধির ধারা-নিকর,
কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে ॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে।

কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমল-পদে,
মুক্তিহেতু যোগী হৃদে ভাসিছে ॥

৯৩

ললিত—তেওট

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজ-দলমা ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী,সমরে বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ॥
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর-নর-হৃদয়ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নর-কর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব-পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥

৯৪

প্রসাদী—একতালা

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো, এ ভবসংসারে আসি ॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, ব'সে দেখ রাজমহিষী ॥

সাধক রামপ্রসাদ

দেহ-জমির জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
হৃদয়মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
কত দুঃখ-কাঁটা পায়ে ফোটে, মুক্ত কর মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতেছে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা, তারার ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥

ললিত—রূপক

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা॥
সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরি-মধ্যা, হরিহর-ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি-পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥

৯৬

সোহিনী-বাহার

এস দেখি মন তুমি আমি বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরু-চরণে রে॥
পদে লুকায়ে সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে॥
গুরু দিয়েছেন যে ধন, অভয়-চরণ কেমনে খরচ করি রে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা, কাঁটা কেটে খোলাসা করি রে।
মধুপুরী যাব, মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরি রে॥

৯৭

প্রসাদী—একতালা

মন কেন তোর ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলি না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন! তাই জান না।
কোন্ লাজে তাঁর মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে করিস্ উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছারডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলোচাল আর বুট-ভিজানা॥

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না।
কেমনে দিতে চাস্ তুই বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।।

৯৮

মূলতানী—একতালা

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এ তনু-তরণী ত্বরা
করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥

৯৯

টুরী-জায়েনপুরী একতালা

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে।
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥
মন-রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে।
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয়জন, ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে॥
যে জোরে একঘরে আমি, সে জোর আমার বজায় আছে।
প্রসাদ বলে বেজাত ম'লে যম যেন আসে না কাছে॥

১০০

ঝংলা — একতালা

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ-নীরে, স্রোতের শেহালার মত॥
আমার যে মা মূল বাঁধা নাই, কোথায় যেতে কোথা দাঁড়াই,
ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান, মাঝে পড়ে হ'লাম হত।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হ'লে,
দাঁড়াও একবার হৃদ্‌কমলে, দেখে যাই জনমের মত॥

প্রসাদী একতালা

মন জান নাকি ঘটবে কি লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ-বায়ু রুদ্ধ ক'রে পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে, দুয়ার আছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, খিঙ্গি খিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ি, বুঝাইব সেটা॥

১০২

প্রসাদী—একতালা

দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ, তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো, কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ, শুনিয়া না শুন, পিতৃ-ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
আমি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা ব'লে, শরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা! মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে আর নাহি লবে॥

১০৩

প্রসাদী— একতালা

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব ওপদ বাঁধা রেখেছে॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে॥

১০৪

জংলা—একতালা

আমার অন্তরে আনন্দময়ী,
সদা করিতেছেন কেলী।
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু'আখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয়বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥

১০৫

পসাদী- একতালা

কাজ কি, মা! সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, প'ড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি-পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা, যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা ব'লে
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥

১০৬

প্রসাদী —একতালা

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়া আছি করপুটে।
কবে আদালত-শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥
সওয়াল-জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমনভয়ে মা, ইচ্ছে হয পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা ব'লে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥

১০৭

ইমন —একতালা

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী তত্থরসি বিগলিতকেশী॥
সেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হ'তে মণিকর্ণি ব'লে তারে ঘোষি॥
অসী-বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥

রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি।
ঐযে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি॥

১০৮

জংলা—একতালা

জাল ফেলে জেলে রয়েছে ব'সে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়.
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥

১০৯

ললিত-বিভাস—আড়াঠেকা

কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমিতো আটাসে নই.
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে ভোগা দিয়ে॥
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, যেন শ্যামা-গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥

১১০

প্রসাদী—একতালা

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বলবে পাগল হ'লো॥
লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥
কালীনামের খড়্গ তুলে' মায়া-মোহ কেটে ফেলো।
ক'রে মিছে মায়ায় টানাটানি রামপ্রসাদের প্রমাদ হ'লো॥

১১১

প্রসাদী- একতালা

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কাল রূপ হ'ল।
কাল বরণ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখ্‌লে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী কাল হ'তে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো॥

১১২

প্রসাদী—একতালা

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি।
(ভব-সংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,হেসে দেও মা হাতচাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার-সমুদ্রপারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥

১১৩

প্রসাদী--একতালা

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেংটা-বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥

১১৪

প্রসাদী—একতালা

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্দ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে ;
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে ব'সে আছে ॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন ক'রে তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে ॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্রসূর্য্য-উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে ॥

১১৫

গাড়া-ভৈরবী—যৎ

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণে-কালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে ॥
দিন তুই-তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে ব'লে ॥

শ্রীরামপ্রসাদে বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী ব'লে, কি করতে পারবে কালে।

১১৬

খাম্বাজ— একতালা

যদি ডুবলো না ডুবায়ে বা ওরে মন-নেয়ে।
মন, হাল ছেড় না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে॥
মন, চক্ষু-দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে॥
মন, শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের যাওরে সারি গেয়ে॥

১১৭

খাম্বাজ আদ্ধা

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন-ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে॥

১১৮

ভৈরবী—একতালা

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না ছাড়িয়ে ছলনা,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হ'লো কাল॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া-জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল॥

১১৯

প্রসাদী—একতালা

মন হারালে কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন
তোর কপাল পোড়া॥

কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ ক'রে বেড়াও, বিধির লিপি
কপালজোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র সোঢ়া॥
প্রসাদ বলে ভাব্‌ছ কি মন পাঁচসোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া

১২০

প্রসাদী—একতালা

আমি নয় পলাতক আসামী।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি॥
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি সাল-তামামি॥
আমি মায়ের খাসে আছি ব'সে, আসল ক'সে সারে জমি।
এবার তোমার নামের জোরে, থাকব ধ'রে নিষ্কর ক'রে
লব ভূমি॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে, ডুবেও পদে হব হামি॥

১২১

জয়জয়ন্তী—একতালা

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে,
মন, ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে, অরি-সুখে হইলি সুখী॥
শিব দুর্গা কালীনাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
তোমার জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি।

[অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় না]

১২২

গৌরী—একতালা

জগত-জননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা॥
দিবা-অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হ'য়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তানছাড়া গো তারা॥

১২৩

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী

১০৭

প্রসাদী একতালা

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এমনি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব-ঘরে ফেরাঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছ'জনেতে কল্লে সারা॥

১২৫

প্রসাদী—একতালা

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবীকে ভাল ভুলিয়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারানাম সারাৎসার, আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুগা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ করেছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা ক'রে ব'সে আছি॥

১২৬

প্রসাদী—একতালা

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায় খেলি॥
প্রাণ ব'লে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি॥
গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবলমাত্র, কতকগুলো গালাগালি॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, ক'রে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালী।

প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী॥

১২৭

প্রসাদী—একতালা

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা, দুঃখে রোদন, সুখে নাচ।
রঙের বেলা রাঙে কড়ি সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটির দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)

১২৮

প্রসাদী—একতালা

ভাল ব্যাপার মন কত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব-তরী কারণ-জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ হারালে লাভে মূলে॥
ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুদ্‌ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় পাদে ডুবিয়ে দিলে॥

পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥

১২৯

প্রসাদী—একতালা

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দকাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল-বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী-জলে-স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা ব'লে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥

১৩০

প্রসাদী—একতালা

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম-জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশি, তরবো কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে (কেবল) কালীনাম
ভরসা আছে॥

১৩১

প্রসাদী—একতালা

ভূতের বেগার খাটবো কত।
তারা, বল আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা, ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভব-সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে ঘুচলো না সে মুখের তিত
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত ॥

১৩২

প্রসাদী—একতালা

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ উমা তাদের মস্তকে বয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য-বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড়-বাহন কালোবরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য-উদয় ॥

১৩৩

প্রসাদী—একতালা

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ি ॥
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা-খেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি-জলে টেনে ফেল ॥

১৩৪

প্রসাদী—একতালা

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে ॥
ভৈরবী ভৈরবসঙ্গে শিশুসঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী তার সমিভ্যারে ॥
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে-ঠোরে ॥

১৩৫

প্রসাদী—একতালা

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল
ডিঙ্গিয়ে পড়ে।
তাদের দমন করবো কি মা! ভয়ে ভয়ে যাচ্চি সরে'।
প্রসাদ বলে কোন বেচালে তারাই পাছে কয়েদ করে॥

১৩৬

প্রসাদী—একতালা

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে, উপবাসী হয়ে প'ড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে প'ড়ে প্রাণ ত্যজিব।

১৩৭

প্রসাদী—একতালা

পূরলো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥

দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবা ভরসা।
আমি বলবো কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাই না দিশা।
অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘট্‌লো আমার উল্‌টা দশা॥

১৩৮

প্রসাদী—একতালা

কেরে বামা কার কামিনী।
ব'সে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাস্‌ছে বদনে, নয়ন-কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী॥
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধ'রে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী॥

(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)

১৩৯

প্রসাদী—একতালা

মনরে, তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাকরে ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরি॥
কালীনামটা বড় মিঠা, বল্‌রে দিবা-শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কালী ব'লে যাব তরি'।
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে তরাবেন এ ভব-বারি॥

১৪০

জংলা থয়রা

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবরবেশে বৃন্দাবনে ॥
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারী ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে
ব্রজকুমারী।
পূর্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব
যমুনা-বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥

১৪১

প্রসাদী--একতালা

কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥

বসন-ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো, এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো, আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥
ত্যজি রত্নহার মা, তোমার ও কণ্ঠে শোভে নরশির।
প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥

১৪২

বাগেশ্রী—ধামার

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিতচিকুর আসব-আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে
গজ গরাসে॥
কেরে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসে।
কেরে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে উঠে
আকাশে॥
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো, কোপ কর দূর, চল নিজ পুর, নিবেদে
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥

আগমনী

১৪৩

রাগিণী—মালশ্রী

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভবাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত-মন, হেসে হেসে এসে
ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দ পাসরে॥

১৪৪

রাগিণী — মালশ্রী

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনীনিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম-জলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে, শুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার;
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে, একি কথা মরি গো॥
রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো॥

পিলুবাহার—যৎ

১৪৫

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই ব'লে
মানবো না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

বিজয়া

১৪৬

রাগিণী—গীত

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার ॥

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়ে না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥

১৪৭

গাঢ়াভৈরবী—আড়া

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা. সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥

১৪৮

গাঢ়াভৈরবী—ঠুংরী

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী, করগো নিস্তার।

যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ-তরি, রাখ এইবার ॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পূরাও মনস্কাম, জপি তারানাম,
তারা তব নাম সংসারের সার ॥
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব-বন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার

১৪৯

বেহাগ—আড়খেমটা

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে ॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো, রাজ্য নিলে পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে ॥
স্রোতের শেহালার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বঁল ধর ধর, কেহ নাবে না অগাধ জলে ॥

বনের পুষ্পে বেলের পাতা, মাগো, আর দিব আমার মাথা
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণি।
তনু-অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥

১৫০

পিলুবাহার—যং

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
সদা গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥

১৫১

প্রসাদী—একতালা

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি ॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ॥

হৃৎকমলে ভাব ব'সে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥

১৫২

লহরী - আড়াঠেকা

মা বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো। বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো, কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধিরধারা, মাগো, গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো, ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥

১৫৩

প্রসাদী—একতালা

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।

শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥

ভাগীরথী বিরাজিত, প্রবাহে অর্দ্ধ শশী।

উত্তর-বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি ॥

শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা-অসী।

তন্মধ্যে মরিলে জীব, শিবের শরীরে মিশি ॥

কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী।

ওমা, রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণ-ধূলার অভিলাষী ॥

১৫৪

প্রসাদী—একতালা

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।

ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥

এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।

তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥

আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।

আছ শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে, রজক-ঘরে তায় ক না ॥

খেয়েছ বিষয়-মদ, সে দের কি ঘোর ঘোচে না।

আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না ॥